ভুতুড়ে কাণ্ড

শিশু-সাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার (২ বার), রঞ্জিৎ স্মৃতি পুরস্কার, ফটিক স্মৃতি
পদক ও মৌচাক পুরস্কার প্রাপ্ত।

রবিদাস সাহারায়

আশা বুক এজেন্সি

৮এ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

প্রকাশক :
ঝর্ণা দত্ত
৮এ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :
শ্রী সুকুমার ঘোষ
নিউ বৈশাখী প্রেস
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা—৬

অলঙ্করণ—মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত ঘোষ
প্রচ্ছদ—মনোজ বিশ্বাস

ভূতের গল্প যে মুখে মুখে বানাতে পারে,
সেই চটপটে ও ছটফটে মেয়ে
দেবস্মিতা মুখার্জী (জুলি) কে—

দাদু

'ভুতুড়ে কাণ্ড'র ভেতর আছে

কলকাতার শহরতলীর হাসপাতালের মেডিকেল ছাত্রদের একটি হোস্টেল। গ্রীষ্মের ছুটিতে ছাত্রাবাস ফাঁকা। সকলেই যার যার বাড়িতে চলে গেছে—শুধু রয়ে গেছে তিনজন ছাত্র অমল, সুধীর আর নীহার। তারা ঠিক করেছে ছুটিটা নষ্ট না করে মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। আগামী বার্ষিক পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করবে—এই তাদের সঙ্কল্প।

সত্যি তারা মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। যে ছাত্রাবাস সব সময় ছাত্রদের হৈ-হুল্লোড়ে মুখরিত থাকত, তা এখন নীরব। কাজেই পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটাবার মত কোন উপদ্রব আর নেই। এত বড় ছাত্রাবাসে রয়েছে মাত্র দু'জন ভৃত্য ও একজন রাঁধুনী ব্রাহ্মণ। তারা গত পূজার ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিল, তাই এবার যায় নি। তাতে অমল, সুধীর আর নীহারেরই সুবিধা হয়েছে। কারণ তাদের খাবার কোন চিন্তা নেই। সময়মত দু'বেলা তাদের আহার জুটছে আর পড়াশোনারও সময় পাচ্ছে প্রচুর।

অনেক রাত পর্যন্তও তারা মাঝে মাঝে পড়াশোনা করে। এনাটমি বিষয়টা খুব জটিল। তাই পড়াশোনার সুবিধার জন্য একটি মরা

মানুষের মাথার খুলি তারা সংগ্রহ করেছে। 'এই মাথার খুলিটা থাকে তাদের পড়ার ঘরের টেবিলে। কলেজের এনাটমি ডিসেক্সন রুমে যে কঙ্কাল রয়েছে—সেই কঙ্কালেরই এটা একটা অংশ। প্রফেসরের অনুমতি নিয়ে এটা কয়েকদিনের জন্য নিয়ে এসেছে।

বেশ ভালভাবেই পড়াশোনা চলছে তাদের।

সেদিন রাত্রে সুধীর ও নীহার একটু আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অমল একাই বসে বসে পড়ছে।

যখনকার কথা বলছি তখন সেই হোস্টেলে ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। হ্যারিকেনের আলোয় ছাত্ররা পড়াশোনা করত।

রাত বোধহয় প্রায় বারোটা। চারদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। অমল একা একা পড়ছিল। তার চোখেও বুঝি ঝিমুনি আসছিল একটু।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে অমল বই থেকে মাথা তুলল। ঘরে যেন কার পায়ের শব্দ। কিন্তু ঘরে তো কেউ নেই। সুধীর ও নীহার তাদের বিছানায় ঘুমোচ্ছে।

মনের ভুল হয়েছে ভেবে অমল আবার পড়ায় মন দিল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে না, মনে মনেই পড়ছে অমল। অর্থাৎ বইয়ের পাতার উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ কিছুক্ষণ পর আবার ঐ রকম একটা শব্দ শুনতে পেল অমল। পায়ের শব্দ। অমল আবার মুখ তুলল। কিন্তু কি আশ্চর্য, এবারও কোন লোক দেখতে পেল না।

ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনতে পেল টেবিলের উপর। তাকিয়ে দেখল মরার মাথার খুলিটা টেবিলের উপর থেকে আস্তে আস্তে শূন্যে উঠে যাচ্ছে।

ব্যাপার দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল অমল। মনে তার ভয়ও জাগল। কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারল না। একবার ভাবল সুধীর আর নীহারকে ডাকবে, কিন্তু মুখের ভাষা যেন তার স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোন কথাই তার মুখ থেকে বের হল না। অসহায়ের মত বসে বসে শুধু দেখতে লাগল।

মাথার খুলিটা উপর দিকে উঠছে—আরও উঠছে। চলে যাচ্ছে

দেওয়ালের দিকে—যেদিকে পায়ের শব্দ সে শুনতে পেয়েছিল, সেখানে মানুষের মাথার সমান উঁচু একটা জায়গায় গিয়ে সেটা স্থির হয়ে রইল। তারপর সেই খুলির মুখ থেকেই যেন কথা বেরিয়ে এল—অমল !

অমল ! মাথার খুলিটা তার নাম ধরে ডাকছে। ভারি তো আশ্চর্যের ব্যাপার !

কৌতূহল আর ভয় জাগল অমলের চোখে মুখে। তবু তাকিয়ে রইল সেদিকে। মাথার খুলিটা বলছে—অমল, আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে কেন এখানে এনে আটকে রেখেছ ?

অমল হতভম্ব ! তবু তার মুখ থেকে কথা বেরিয়ে এল—তোমাকে আটকে রাখিনি তো। তোমাকে তো টেবিলের উপরেই রেখে ছিলাম।

মাথার খুলিটা বলল—আমার শরীরটা রয়েছে লেবরেটরীর ঘরে। কিছুদিন আগে কয়েকটি উচ্ছৃঙ্খল ছেলে আমার ধড় থেকে মুণ্ডটা খুলে ফেলেছিল। কেউ আর সেটা জুড়ে দেয়নি। ঐ ভাবেই রয়েছে সেই থেকে। তারপর তুমিই তো সেদিন আমাকে এখানে নিয়ে এলে।

অমল বলল—তুমি কি আমাকে চেন ? আমার নাম জানলে কেমন করে ?

মাথার খুলিটা বলল—চিনব না কেন ? এখানকার অনেককেই তো আমি চিনি। এই হাসপাতালেই এক বছর আগে আমার মৃত্যু হয়েছিল।

—কি বললে ? এক বছর আগে তোমার মৃত্যু হয়েছিল এই হাসপাতালে ?

—হ্যাঁ। আমার নাম ইয়াসিন। আমি 'বি' ওয়ার্ডে সাত নম্বর বেড-এ ছিলাম। ছুরি-বেঁধা অবস্থায় আমাকে হাসপাতালে ভরতি করিয়ে দিয়েছিল পথের কয়েকজন লোক। তারপর আমার দলের লোকেরা খবর পেয়ে আমাকে হাসপাতালে দেখতে এসেছিল। যে

ডাক্তারবাবু আমাকে চিকিৎসা করতেন তাঁর সঙ্গে তুমিও তো আমাকে দেখতে যেতে।

—তোমাকে ছুরি মেরেছিল কারা ?

—আমাদের বিপক্ষ দল।

—বিপক্ষ দল মানে ? তুমি কি পার্টি করতে নাকি ? রাজনীতি করতে ?

—না, ওসব পার্টি নয়। আমাদের ছিল চোরাই মাল চালান করার পার্টি। আমিই ছিলাম লীডার। আমার কাছ থেকে আটঘাট শিখে নিয়ে দু'জন লোক দল ছেড়ে দিয়ে নিজেরা পার্টি করল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে পেরে উঠল না। আমরা যে-ভাবে মালপত্র যোগাড় করতাম, সে-ভাবে যোগাড় করতে পারত না। তাই আমার উপর হল ওদের হিংসা।

—সেজন্য তোমাকে ছুরি মেরেছিল ? তুমি পুলিশের কাছে ওদের নাম বলোনি ?

—হ্যাঁ, নাম বলেছিলাম। কিন্তু পুলিশ ওদের খুঁজে পায়নি। ওদের কি কোন আস্তানার ঠিক আছে ?

—তোমাকে মেরে ওদের লাভ হয়েছিল কি ?

—না, হয়নি। আমি যার কাছ থেকে চোরাই মাল সংগ্রহ করতাম তার নাম ছিল বদ্রিলাল। আমার দল থেকে চলে যাবার পর নাসিম আর আমজাদ বদ্রিলালের কাছে সেই মাল সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বদ্রিলাল ওদের বিশ্বাস করত না। বদ্রিলাল খুব কম মালপত্র ওদের দিত। তাই নাসিম আর আমজাদ ভেবেছিল, আমিই ওদের পথের কাঁটা। আমাকে না সরালে ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সেজন্যই মেরেছিল আমাকে।

—তারপর ?

—আমি হাসপাতালে মারা গেলাম। আমাকে মর্গে পাঠানো হয়েছিল। আমার দলের লোকেরা সেখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল কবরখানায়। আমাকে কবর দিল।

কিন্তু ভাগ্যের কি খেলা! আমি যে চোরাই মালের কারবার করতাম, মরার পরও পড়ে গেলাম সেই চোরাইমাল পাচারকারীদের হাতে। আমার কঙ্কালটাও রেহাই পেল না। যে সব লোকেরা কঙ্কালের চোরা কারবার করে তারা একদিন আমার কঙ্কালটাও তুলে নিয়ে গেল। তারপর হাত বদল হয়ে আমার কঙ্কালটাও এসে গেল এই হাসপাতালে।

অমল স্তব্ধ হয়ে কথাগুলি শুনল। তারপর জিজ্ঞেস করল—তাহলে এখন সেই নাসিম আর আমজাদ খুব চোরাইমালের কারবার করছে?

ইয়াসিন বলল—না, সেই সুযোগ তাদের দেইনি। নাসিম হল দলের পাণ্ডা। তাকে একদিন রাত্রিবেলা পেয়ে গেলাম নির্জন জায়গায়। ধাপার মাঠের কাছে। তাকে গলা টিপে ধরলাম। সে অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করল আমার সঙ্গে। কিন্তু পারল না। আমার সঙ্গে শক্তিতে সে পারবে কেমন করে? আমার গায়ের জোর চিরকালই ওর চাইতে বেশি। তবু লড়েছিল অনেকক্ষণ। ওর কাছে একটা ছুরি ছিল। ছুরি নিয়েই সব সময় চলাফেরা করত। কিন্তু ছুরি দিয়ে আমাকে মারবে কেমন করে? ওর রক্ত মাংসের শরীর, আর আমি ছায়া হয়ে ওর সঙ্গে লড়াই করছি। এক সময় ওকে খতম করে দিলাম। ওর ছুরি দিয়েই ওকে শেষ করলাম।

অমল চমকে উঠে বলল—এঁ্যা, বল কি?

ইয়াসিনের মাথার খুলিটা বলল—হ্যাঁ। নাসিম এই ভাবে খতম হল। এরপর আমজাদও একদিন ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। একটা চোরাইমাল পাচার করতে গিয়ে হাতে হাতে ধরা পড়ল। জেল হল তার। তারপর থেকে আমজাদ এই কাজ ছেড়ে দিল।

অমল বলল—কিন্তু তোমার এই অবস্থা কেন? তুমি কি চাও আমার কাছে?

ইয়াসিন বলল—আমি চাই মুক্তি।

—তোমাকে কি ভাবে মুক্তি দেব আমি?

—শোন তা হলে। তোমাকে একটা গোপন খবর বলছি। তাতে

তুমিও বেঁচে যাবে, আমিও ভালভাবে থাকতে পারব।

—বল, কি বলতে চাও তুমি ?

—যে ঘরে কঙ্কালগুলি আছে সে ঘরের দারোয়ান কঙ্কালগুলিকে বিক্রি করে ফেলবার মতলব করেছে। যারা এই সব ব্যবসা করে তাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে সে। রাত্রে চোর হয়ে তারা চুরি করবে। তার আগে দারোয়ানকে বেঁধে ফেলবে তারা। তারা চুরি করবে কঙ্কাল আর দু একটি মূল্যবান যন্ত্র। আমার কঙ্কালটাকেও বাদ দেবে না তারা। তা হলে আমি মুণ্ড ছাড়া হয়ে পড়ব।

—এই ব্যাপারে আমাকে কি করতে হবে ?

শোন, এই ছুটির সময় তোমাদের মেসে কোন ছাত্র নেই। তোমাদের টেবিলে আমার মুণ্ডটা আছে। কাজেই এই চুরির পর তোমাদের উপরও দোষ পড়তে পারে। আমি চাই না তোমরা কোন বিপদে পড়ো। তুমি খুবই ভাল লোক। আমি জানি, এই হাসপাতালের বিছানায় থাকার সময় তুমি খুব যত্ন নিয়ে তোমার ডাক্তারের সঙ্গে থেকে আমাকে দেখতে। তা ছাড়াও মাঝে মাঝে আমার খবর নিতে। অনেক ডাক্তারই বড় নিষ্ঠুর, তাঁদের মায়া মমতা নেই। তাঁরা রোগীদের ভাল করে দেখেন না। রোগীদের জীবনের মূল্য বোঝেন না, তাদের দুঃখ কষ্ট বোঝেন না। তুমি সেই ধরনের লোক নও। তাই তোমাকে বাঁচাবার জন্য আমার এত আগ্রহ। তোমরা তিনজন এখানে আছ, এখনই তোমরা হাতে কোন অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। তবে তোমাদের কাছে অনুরোধ, আমার মুণ্ডটা আমার কঙ্কালের সঙ্গে জুড়ে দিও। তা হলে আমার আত্মা শান্তি পাবে। আমি এখন যাই।

ধীরে ধীরে মুণ্ডটা আবার বাতাসে ভাসতে ভাসতে এসে টেবিলের উপর হাজির হল। কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মত বসে রইল অমল। একটু আগে যে ঘটনাটা ঘটে গেল, সেটা সে নিজেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে সে কি স্বপ্ন দেখছিল না কি নিজেই এসব উদ্ভট কল্পনা করছিল !

বসে বসে ভাবতে লাগল অমল, এখন সে কি করবে? সুধীর আর নীহারকে জাগিয়ে তুলবে কি? যাবে কি সেই লেবরেটরী রুমের কাছে? ওদের জাগিয়ে তুলে বলবে কি নরমুণ্ডের বিচিত্র কাহিনী? ওরা হয়ত বিশ্বাস করবে না। পাগল বলেই তার কথা উড়িয়ে দেবে।

কিন্তু....স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না অমল। তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সে গিয়ে জাগিয়ে তুলল সুধীর আর নীহারকে। বলল—ওঠ্ ওঠ্ শীগ্গীর!

ধড়মড় করে উঠে বসল সুধীর আর নীহার। ঘুম ঘুম চোখেই বলল—কি হয়েছে রে অমল?

অমল বলল—চল্, লেবরেটরী রুমের দিকে যাই। ওখানে চোর এসেছে।

—চোর? কে বলল?

—হ্যাঁ, আমি খবর পেয়েছি।

—লেবরেটরী ঘরে চোর এসেছে তো আমাদের কি?

—কঙ্কাল চুরি করতে এসেছে চোর। কঙ্কাল চুরি হলে আমাদের উপর হয়ত দোষ পড়বে। চল্, এখনও গেলে চোরকে তাড়ানো যাবে।

—চোর যদি আমাদের ঠেঙায়?

—সেজন্য তৈরি হয়ে যেতে হবে। লাঠি নিয়ে চল্।

লাঠি নেওয়া সত্যি দরকার। কিন্তু লাঠি কোথায় পাবে? হকি ষ্টিক ছিল, তাই তিনজন তিনটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

লেবরেটরী রুমের কাছে এসে তারা তিনজনেই তাজ্জব। দেখল, সত্যি সেখানে চোর হানা দিয়েছে। দরোয়ানকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বারান্দার এক পাশে ফেলে রেখে লেবরেটরীর দরজা চাবি দিয়ে খুলে ফেলেছে চোরেরা।

অমল, সুধীর আর নীহার হৈ হৈ করে শোরগোল তুলল। হকি ষ্টিক দিয়ে আঘাত করতে লাগল মাটির উপর—যাতে চোরেরা ভয় পায়। চোরেরা ভয় পেলেও বাঁচবার জন্য রুখে এল অমল, সুধীর আর নীহারের দিকে। কিন্তু তাতে সুবিধা করতে পারল না। হৈ চৈ

শুনে ততক্ষণে এদিক ওদিক থেকে আরও লোক এগিয়ে এসেছে। তিনজন চোরই ধরা পড়ল।

মস্ত বড় একটা চক্রান্তের সূত্র ফাঁস হয়ে গেল। সেই সূত্রেই ধরা পড়ল কঙ্কাল চোরা-কারবারী দল।

দরোয়ান বুঝতে পারল তারও অব্যাহতি নেই। সে গোপনে দোষ স্বীকার করল অমল, সুধীর আর নীহারের কাছে। তাদের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে প্রতিজ্ঞা করল, আর কোনদিন সে এমন কাজ করবে না।

দরোয়ানের চাকরি রয়ে গেল। কিন্তু এসব কাণ্ডকারখানার মূলে যে ইয়াসিনের প্রেতাত্মা, একথা সুধীর আর নীহার কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না। তারা বলল, তুই নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছিলি। মরা-মানুষের মাথার খুলি কথা বলে, আমরা তা বিশ্বাস করি কি ভাবে?

অমলও বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু এ ব্যাপার যে সত্যি ঘটেছিল। না ঘটলে চোরের খবরই সে জানত কেমন করে?

অমলের কৌতূহল এরপর সত্যি খুব বেড়ে গিয়েছিল। সে হাসপাতালের খাতাপত্র ঘেঁটে বের করেছিল এক বছর আগে মহম্মদ ইয়াসিন নামে সত্যি একজন রোগী ছুরিকাঘাতে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। সে ছিল 'বি' ওয়ার্ডে সাত নম্বর বেডে। তিন দিন পর তার মৃত্যু হয়েছিল।

ঘটনা খুবই আশ্চর্য!

যাঁরা পরলোক বিশ্বাস করেন তাঁরা হয়ত বলবেন, যে ঘৃণ্য কাজ করত ইয়াসিন, সেই কাজের উপর তার বিতৃষ্ণা এসেছিল। সে নিজেও হয়েছিল সেই ঘৃণ্য ব্যবসায়ের শিকার। তাই তার অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়াত সেই ঘৃণ্য ব্যবসায়ীদের ধরিয়ে দেবার জন্য।

অমল কিন্তু ইয়াসিনের প্রেতাত্মার অনুরোধ রক্ষা করেছিল। লেবরেটরী রুমে সে ভাঙ্গা কঙ্কালের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল তার খণ্ডিত মুণ্ড। তাতে ইয়াসিনের আত্মার হয়ত তৃপ্তি হয়েছিল।

ভূত তাড়ানো ওঝা

গল্পটা শুনেছিলাম আমাদের গ্রামের স্কুলের এক মাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকে। এটা নাকি তাঁর দাদুর জীবনের একটা সত্য ঘটনা। সত্য কি মিথ্যা কিছুই জানি না তবে গল্পটা শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।

মাস্টারমশাইরা থাকতেন পূর্ব-বাংলার ঢাকা জেলার এক পল্লীতে। গাঁয়ের নাম মুস্থরিখোলা। বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে মুস্থরিখোলা গ্রামটি একটি কারণে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। সপ্তাহে একদিন বিরাট হাট বসত নদীর পাড় ও বাজার এলাকা জুড়ে। সেদিন জমজমাট হয়ে উঠত মুস্থরিখোলা।

সপ্তাহের অন্যদিন মুস্থরিখোলা থাকত নির্জন নিঝুম পল্লী। নদী থেকে কিছুটা দূরে একটা কুঁড়ে ঘরে থাকত এক বুড়ী। সবাই তাকে ডাইনী বুড়ী বলে ডাকত। তার তিনকূলের খবরও কেউ রাখত না। তার আসল নামও জানত না কেউ। বুড়ীর বয়স হয়েছিল। মাথার চুলগুলি ছিল সাদা ধবধবে। সারা গায়ে ছিল বড় বড় লোম। হাতে একটা বাঁকা লাঠি নিয়ে চলাফেরা করত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ওকে দেখলেই ভয় পেত। কেউ ওর কাছে যেত না, গাঁয়ের মধ্যেও

সে বেশি আসত না। দূর থেকে সবাই তাকে পাগলী ডাইনী বলে ডাকত।

সেই গ্রামে আর একজন লোক ছিল তার নাম বেচু মণ্ডল। সবাই তাকে বেচু ওঝা বলে ডাকত। গ্রামের কাউকে ভূতে পেলে বা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে আবোল তাবোল বকলে ডাক পড়ত বেচু ওঝার। সে মন্ত্র পড়ে, নানারকম তুকতাক করে লোককে সুস্থ করে তুলত। সে-ই বলে বেড়াত, পাগলী ডাইনী থেকে সাবধান! বড় সাঙ্ঘাতিক ঐ বুড়ী, ও ভূত চালান করতে পারে, লোকের উপর রেগে গেলে ক্ষতি করতে পারে খুব।

বেচু মণ্ডলের কথা শুনেই হয়ত কেউ পাগলী ডাইনীকে ঘাঁটাতে সাহস করত না। গ্রামের সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন ভাবেই জীবন যাপন করত বুড়ী। ও যেন নির্জন দীপান্তরে বাস করত।

কিভাবে বুড়ীর দিন চলত কে জানে? আগে নাকি গাঁয়ে এসে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করত। কিন্তু ছেলেমেয়েদের জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত সে। ক্ষেপাত, ঢিল ছুঁড়ত। তাই এখন আর ভিক্ষা করতে আসে না।

শোনা যায়, ভর দুপুরে যখন চারদিক নির্জন থাকে, যখন পথে ঘাটে বা নদীর পাড়ে কোন লোকজন থাকে না, তখন বুড়ী বের হয়। নদীর পাড়ে গিয়ে মাছ ধরে। সেই কাঁচা মাছ সে খায়।

কেউ কেউ বলে, নদীর পাড়ে শ্মশানে আধপোড়া মানুষের মাংসও খায় সে।

কত কথাই শোনা যেত পাগলী ডাইনীর সম্বন্ধে।

একদিন শোনা গেল পাগলী ডাইনী তার ঘরে মরে রয়েছে। তার আপন লোক কে আছে যে তার সৎকার করবে? গাঁয়ের লোক খবর শুনে কেউ কেউ দূর থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, খুব কাছে গিয়ে দেখল না কেউ। সৎকার করবার জন্যও কেউ এল না। ডাইনীবুড়িকে ছুঁলে আবার কোন্ বিপদ হবে কে জানে।

তার মরা দেহটার কি হল তার খবরও গাঁয়ের লোকেরা আর

নেয়নি। তার উত্তর দিকে কিছুটা দূর দিয়ে গ্রামের সবাই স্নান করতে নদীর ঘাটে যায়। কেউ কেউ বাঁ দিকে মুখটা ঘুরিয়ে একটু তাকায় ডাইনীবুড়ির কুঁড়ে ঘরটার দিকে। ব্যস, ঐ পর্যন্তই।

মুস্থুরিখোলার কাছেই ছিল কলাতিয়া গ্রাম। সেই কলাতিয়া গ্রামের বিনোদ মণ্ডলের মেয়ের বিয়ে হল মুস্থুরিখোলার মাধব বেপারীর ছেলে যাদবের সঙ্গে। মাধবরা মুস্থুরিখোলার ধনী গৃহস্থ।

একদিন দুপুর বেলা বাড়ির অন্য একটি বৌয়ের সঙ্গে যাদবের বৌ গিয়েছিল নদীতে স্নান করতে। অন্যান্য দিন যে সময়ে স্নান করতে যায় সেদিন তার চেয়ে একটু বেশি বেলা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সঙ্গী সাথীও বিশেষ ছিল না, আর নদীর ঘাটেও কোন লোক ছিল না।

সেদিন বিকেল থেকেই হঠাৎ যাদবের বৌয়ের অবস্থা কি রকম হয়ে গেল। চোখতুটো ঘোলা ঘোলা হল, মাথারও কি রকম বিকৃতি দেখা দিল। বলতে লাগল কি সব আবোল তাবোল কথা! কিছুই তার অর্থ বোঝা যায় না। একবার বলে—'আমি ভাজা মাছ খাব, আমাকে মাছ দে।' আবার বলে—'আমার সঙ্গে আর ঠাট্টা করবি ?'

বাড়ির লোকেরা হতভম্ব! নতুন বৌয়ের আবার কি হল ?

পাশের বাড়ির লোকেরা ডেকে আনল বেচু ওঝাকে। বেচু ওঝা আসতেই যাদবের বৌ কট্‌মট করে তার দিকে তাকাল। তারপর রেগে গিয়ে বলল—'তুই এখানে এসেছিস কেন ? চলে যা, চলে যা!'

বেচু ওঝা ওসব কথায় গ্রাহ্য করল না। সে কিছুক্ষণ নানারকম তুকতাক করল, তারপর বলল—ওকে পাগলী ডাইনীর ভূতে ধরেছে। বড় শক্ত ভূত।

মাধব বেপারী জিজ্ঞেস করল। পাগলী ডাইনী তো কবে মরে গেছে। সে মরে গিয়েও আবার ভূত চালান করল নাকি ?

বেচু ওঝা বলল—না, ও নিজেই পেত্নী হয়ে তোমার ছেলের বৌয়ের উপর ভর করেছে।

বাড়ির সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। তা হলে কি হবে ?

বেচু ওঝা বলল—চিন্তা করো না। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

বেশি করে কিছু সরষে আনাও, আর বাজার থেকে একটি নতুন মাটির কলসী কিনে নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সব কিছু নিয়ে আসা হল।

বাড়ির যে বউটির সঙ্গে যাদবের বউ নদীতে চান করতে গিয়েছিল তাকে ডেকে বেচু ওঝা জিজ্ঞেস করল—তোমরা যখন নদীতে চান করছিলে তখন নদীর ঘাটে আর কেউ ছিল?

বউটি বলল না।

বেচু ওঝা জিজ্ঞেস করল—পথে আসবার সময় বা যাবার সময়ও কাউকে তোমরা দেখতে পাওনি?

তখন বউটি কি যেন মনে করবার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ ভেবে বলল—হ্যাঁ, আসবার সময় একটি অচেনা বুড়ীকে আমাদের সমুখ দিয়ে পথটা পার হতে দেখেছিলাম।

—কি রকম বুড়ী?

—খুনখুনে বুড়ী। লাঠি ভর দিয়ে হাঁটছিল।

—তারপর?

—বুড়ীটা আমার সমুখ দিয়ে হেঁটে যাদবের বউয়ের গা ঘেঁষে চলে গেল।

—কোথায় চলে গেল?

—তারপর কোথায় যে গেল দেখতেই পেলাম না।

বেচু ওঝা বলল—বুঝতে পেরেছি, ঐ পাগলী ডাইনীটাই ভর করেছে এর ওপর।

মাধব বেপারী হতাশভাবে বলল—তাহলে কি হবে? তুমি বউ-মাকে সারিয়ে দিতে পারবে তো বেচু?

বেচু বলল—দেখি কি করতে পারি।

কিছুক্ষণ আগে যাদবের বৌ তেজ দেখিয়ে ওঝাকে চলে যেতে বলেছিল। কিন্তু সে এবার যেন নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগল। মনে হল তার জ্ঞান ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। তার শরীরের রং কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

বেচু ওঝা বলল—ডাইনী বুড়ী ওর গায়ের রক্ত চুষে নিচ্ছে।

মাধব বেপারী প্রায় পায়ের ওপর এসে পড়ল বেচু ওঝার। বলল —তুমি যে ভাবে পার আমার ছেলের বউকে বাঁচাও। তুমি যত টাকা চাও তাই তোমাকে দেব।

বেচু ওঝা বলল—আচ্ছা, আমিও দেখছি পাগলী ডাইনীর কত শক্তি।

বেচু ওঝা যাদবের বৌয়ের কাছে এসে বসল। তারপর বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে বৌটির পাশে একটা গণ্ডী কাটল।

বাড়ির লোকদের বলল—এবার একটু সিঁদুর, একটু সরষের তেল আর একটা ঝাঁটা চাই।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু জিনিস এনে হাজির করা হল।

জিনিসগুলি আসতেই বেচু ওঝা তেল সিঁদুর দিয়ে একটা তিলক কাটল নিজের কপালে। বৌটির কপালেও একটা সিঁদুরের বড় ফোঁটা দিয়ে দিল। সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়ার সময় সেই নিস্তেজ অবস্থাতেই বৌটি হঠাৎ চোখ মেলে ওঝার দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠল।

দুচোখ টকটকে লাল। মনে হল শরীরের সব রক্ত যেন ঐ চোখ দুটিতে এসে জমা হয়েছে। তখনই আবার চোখ বুজে ফেলল।

বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র পড়তে লাগল ওঝা আর বৌটির গায়ে সরষে ছিটাতে লাগল। তাতেও কোন ফল হচ্ছে না দেখে বেচু ওঝা বলল—ঝাঁটাটা এবার আমার হাতে দাও।

একজন ছুটে এসে ঝাঁটাটা বেচুর হাতে দিল। ওঝাদের ভাষায় কি সব গালাগাল দিতে দিতে বৌটির গায়ে ঝাঁটা দিয়ে পিটাতে লাগল বেচু ওঝা। দু'তিনবার ঝাঁটা মারতেই বৌটি নিস্তেজ অবস্থা থেকে হঠাৎ যেন সতেজ হয়ে উঠল। ঝাঁপিয়ে পড়ল বেচু ওঝার ওপর। তারপর তার হাতে গলায় আচড়াতে ও কামড়াতে লাগল।

বেচু ওঝাও বিব্রত হয়ে পড়ল খুব। সে কোন মতে বৌটির হাত থেকে রেহাই পেয়ে একটু দূরে গিয়ে জোরে জোরে মন্ত্র আওড়াতে লাগল আর ঝাঁটা মারতে লাগল। বৌটি এবার চীৎকার করে বলল

—চলে যা, চলে যা এখান থেকে।

গলার স্বর কিন্তু বৌয়ের গলার মত নয়। মনে হয় কোন বুড়ীর গলা। তাই বেচু ওঝা ধমক দিয়ে বলল—তুই কে বল্। কেন এসেছিস? নইলে তোকে ছাড়ব না।

বলেই আবার ঝাঁটা মারতে লাগল। এবার ডুকরে কেঁদে উঠল বৌ-বেশিনী ডাইনী বুড়ী। বলল—আর মারিস না, আমি ডাইনী পাগলী।

বেচু ওঝা বলল—তুই কেন যাদবের বৌকে ধরলি?

ডাইনী বুড়ী বলল—ভর দুপুরে ও নদীতে চান করতে গিয়েছিল কেন?

বেচু ওঝা বলল—তাতে কি হয়েছে? তুই ধরলি কেন?

ডাইনী বুড়ী বলল—আমার চলতি পথের সামনে পড়েছিল কেন?

বেচু ওঝা এবার আর একবার ঝাঁটা মারল। মারতে মারতে বলল—ন্যাকামীর আর জায়গা পাসনি? তুই কবে মরে গিয়েছিস, এখন আবার আসিস কেন এই গাঁয়ে? শীগগীর পালা এখান থেকে। আরও দু'তিনবার ঝাঁটা মারল বেচু ওঝা। ডাইনী বুড়ী আর্তকণ্ঠে বলল—আমার যে এখনও মুক্তি হয় নি। আমি এ গাঁয়ের আশে পাশেই আছি।

বেচু ওঝা এবার আরও বেশি করে সরষে ছিটাতে লাগল আর ঝাঁটা মারতে লাগল দুম দাম করে। বৌটির গা বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। মাধব বেপারী এবার একটু ঘাবড়েও গেল। তার ছেলের বৌয়ের গায়ে এমন ভাবে ঝাঁটা মারছে আর রক্ত বেরুচ্ছে—ইস্। সে বেচু ওঝাকে বলল—অমন করে মেরো না বেচু। যাদবের বৌ যে মরে যাবে।

বেচু বলল—অত মায়া করলে ছেলের বৌকে ফিরে পাবে না। ডাইনী বুড়ী যে ওকে প্রায় শেষ করে ফেলেছে।

চারদিকে তখন লোক জমে গেছে অনেক। কেউ মজা দেখছে,

কেউ মনে দুঃখও পাচ্ছে। বেচু ওঝা মন্ত্র পড়ছে, সরষে ছড়াচ্ছে আর ঝাঁটা মারছে। চীৎকার করে কাঁদছে বৌটা। বলছে—আর মারবি না, এই আমি চলে যাচ্ছি।

মাধব বেপারী বলল—আর মেরো না বেচু। একটু ক্ষেমা দাও। ও যখন বলছে তখন হয়তো সত্যি চলে যাবে।

বেচু ওঝা একটু থামল। দেখতে লাগল—এরপর কি ঘটে।

বৌটা বসে বসে তখন হাঁপাতে লাগল। শরীর থেকে ঘাম ঝরছে রক্তও ঝরছে। দেখে মনে হল তার আয়ু যেন শেষ হয়ে আসছে। এবার খুব ভয় পেয়ে গেল মাধব বেপারী। ভূত তাড়াতে গিয়ে তার ছেলের বৌ যদি মারা যায় তা হলে আর লাভ হল কি ?

মাধব হাত জোড় করে বলল—ডাইনী মা, তুমি দয়া কর, আমার ছেলের বৌকে ছেড়ে দাও। তুমি যা করতে বল তাই করব। আমার ছেলের বৌকে কষ্ট দিও না।

ছেলের বৌয়ের ওপর ভর করা ডাইনী চোখ কটমট করে বলল——তোর ছেলের বৌ আমার গায়ে একদিন ঢিল মেরেছিল, আমি ব্যথা পেয়েছিলাম, সে কথা মনে নেই ?

মাধব বলল—সে আবার কবে ? আমার ছেলের তো নতুন বিয়ে হয়েছে।

পাগলী ডাইনী বলল—সে অনেকদিন আগে। তখন ওর বিয়ে হয়নি। আমি ওদের কলাতিয়া গ্রামে গিয়েছিলাম। সেদিন ওদের গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা খুব মেরেছিল আমাকে। এতদিন পরে ওকে ধরতে পেরেছি, ছাড়ব কেন !

বেচু ওঝা বলল—দেখলে বেপারী, পাগলী ডাইনী হাড় বজ্জাত। সোজা ভাবে ও যাবে না। ওকে আরও সাজা দিতে হবে। একটা লোহার শিক পুড়িয়ে আন তো। পুড়িয়ে লাল টকটকে করে নিয়ে এস।

সত্যি তাই করা হল, লাল টকটকে লোহার শিকটা কাছে আনতেই বৌয়ের ওপর ভর করা ডাইনী বুড়ী চেঁচিয়ে উঠল—ও বাবারে, আমি

চলে যাচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দে, আগুনের সেঁকা দিসনি।

বেচু ওঝা বলল—চলে যা শীগগীর। তা হলে আগুনের সেঁকা দেব না।

ডাইনী বুড়ী বলল—কেমন করে যাব? গণ্ডী রয়েছে যে।

বেচু ওঝা মন্ত্র পড়ে গণ্ডীটা তুলে দিল। সেই মুহূর্তে রুদ্র মূর্তি ধারণ করে বৌটা উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গেল বাইরের দিকে। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না। কিছুদূর গিয়েই আবার পড়ে গেল।

জ্ঞান হারিয়ে মাটির ওপর পড়ে গেল বৌটি।

বেচু ওঝা তার কাছাকাছি গিয়ে বসল। পরীক্ষা করে দেখল সত্যি বৌটির জ্ঞান নেই। তখন সে বলল—কেউ একটা শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে নিয়ে এসো তো।

তাই নিয়ে আসা হল। পোড়া শুকনো লঙ্কা নাকের কাছে রাখতেই বৌটির জ্ঞান ফিরে এল। চোখ মেলে তাকাল বৌটি। তখন বেচু ওঝা বলল—বল্ পাগলী ডাইনী, এখনও যাবি কিনা।

কিন্তু যাবার কোন ভাব দেখাল না ডাইনী। তখন সেই পোড়া লোহার শিকটি বেচু ওঝা ওর গায়ে লাগিয়ে দিল। তখন ডাইনী বুড়ীর হেড়ে গলায় কী চিৎকার! সেই চিৎকারে চারদিকের লোকেরা ভয় পেয়ে গেল।

ডাইনী বুড়ী বলল—উঃ মরে গেলাম!

বেচু ওঝা বলল—চলে যা শীগগীর! নইলে আবার দেব সেঁকা।

ডাইনী বুড়ী চেঁচিয়ে বলল—না না, চলে যাচ্ছি। আর সেঁকা দিও না।

বেচু ওঝা বলল—কি করে বুঝব তুই চলে যাচ্ছিস? ঐ জলভরা মাটির কলসীটা মুখে তুলে নিয়ে যা। যাবার সময় কোন গাছের ডাল ভেঙ্গে দিয়ে যাবি।

ডাইনী বলল—আচ্ছা, তাই করব।

—আর কখনো এ গাঁয়ে আসবি না তো?

—না।

—যা তবে।

নতুন মাটির কলসীতেই আগেই ওঝার নির্দেশে জল ভরে রাখা হয়েছিল। সেটা এবার কাছে এনে দেওয়া হল। বৌটি দাঁত দিয়ে কলসীর কানা কামড়ে ধরে জল ভরা কলসীটি তুলে নিয়ে ছুটে গেল বাইরের দিকে। উঠোনটা ছাড়িয়ে যেতেই মুখ থেকে কলসীটা ফেলে দিয়ে আবার সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

হঠাৎ একটা ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেল যেন। দেখা গেল বাড়ির শেষ সীমানার চালতে গাছের একটা ডাল মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়ল।

বেচু ওঝা বলল—এবার সত্যি ডাইনী বুড়ীর ভূতটা চলে গেছে। এবার যাদবের বৌকে সুস্থ করে তোল।

মাথায় জল ঢেলে বাতাস দিয়ে সুস্থ করে তোলা হল যাদবের বৌকে। ভাল রকম সুস্থ হতে বেশ কিছু সময় লাগল। গরম দুধ খাইয়ে তাকে আরও চাঙ্গা করে তোলা হল। দেখা গেল তার চোখ দুটি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

যাদবের বৌ সম্পূর্ণ সুস্থ হবার পর চারদিক তাকাতে লাগল। তার কাপড় চোপড় জলে ভিজে গেছে। শরীর কর্দমাক্ত। তাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। শুকনো কাপড় পরিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল তাকে।

এরপর বেশ কিছুদিন ডাইনী পাগলীর কোন উপদ্রবের কথা শোনা যায় নি। কিন্তু মাঝে মাঝেই নাকি ডাইনী বুড়ীর সেই জীর্ণ শীর্ণ কুটীরের আশে পাশে রাত বিরেতে তার প্রেতাত্মা দেখে লোকে ভয় পেত।

তার পরের বছর একদিন প্রচণ্ড ঝড় হল। সেই ঝড়ে উড়ে গেল ডাইনী পাগলীর কুঁড়ে ঘর। তার কোন চিহ্নও রইল না।

এরপর ডাইনী বুড়ীর প্রেতাত্মাও কেউ আর দেখেনি।

ঘটনাটা অনেক দিনের পুরনো। এখন কিন্তু কেউ আর একথা বিশ্বাস করতে চায় না। বলে, আগেকার ভুত ছিল সেকেলে, এখন মডার্ণ হয়ে গেছে।

কালীগঞ্জের থানার দেওয়াল ঘড়িতে তখন রাত বারোটা।

শীতের রাত। চারদিক নিঝুম।

ঝিকুরগাছির এক প্রান্তে এই থানা। এই অঞ্চলে লোকালয় খুব বেশি নেই। বেশ ফাঁকা জায়গা। পেছনের দিকে একটা পুকুর, সামনের দিকে পায়ে চলতি পথ। সেই পথে লোকজন এমনিতেই কম চলে। তার উপর শীতের রাতে—বিশেষ করে এই রাত বারোটার সময় এই জায়গাটা যে আরও নির্জন হয়ে উঠবে তাতে আর বিচিত্র কি?

থানার কনস্টেবলরাও প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু পাহারারত একজন সিপাই বেঞ্চিতে বসে ঢুলছে। অন্যদিকে এই সময়ে থানার দারোগা প্রতাপ পাকড়াশী তাঁর দপ্তরে থাকেন না, বাড়ি চলে যান। আজ তিনি কি একটা তদন্তের জরুরী রিপোর্ট লিখতে থানায় রয়েছেন। লিখতে লিখতে তাঁরও জড়তা আসছে।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। দারোগাবাবু বিরক্ত ভাবে দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালেন। তারপর মুখের বিশ্রী ভঙ্গি করে বলে উঠলেন, এত রাতে ফোন? কি আপদ! রিসিভারটা তুলে

বললেন—হ্যালো!

অপরদিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল—ঝিকড়গাছি থানা?

হ্যাঁ, বলুন।

আপনি এক্ষুণি একবার চৌধুরী লেন-এ আসুন। দশ নম্বর বাড়িটায় একটা ছেলে ফাঁসী দিয়ে মরেছে।

ফাঁসী?

হ্যাঁ, ভীষণ সিরিয়াস ব্যাপার। চিলে কোঠার ছাদে....শীগগীর আসুন। নইলে...

হঠাৎ লাইনটা কেটে গেল।

দারোগা প্রতাপ পাকড়াশী চেঁচিয়ে বললেন—হ্যালো, হ্যালো... কিন্তু ওদিক থেকে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। প্রতাপ পাকড়াশী রিসিভারটা সশব্দে ক্র্যাডেলে রেখে দিতে দিতে বললেন—এত রাতে কি ঝামেলা!

একবার ভাবলেন যাবেন না, কাল ভোরে যাবেন। এত রাতে এই ঝামেলায় গিয়ে লাভ কি? কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন, যে লোকটি ফোন করেছে সে বলেছে—সিরিয়াস ব্যাপার! কাজেই....

কলিংবেলটা জোরে টিপতেই পাহারাদার সিপাইয়ের ঝিমুনি ছুটে গেল। দারোগাবাবু বললেন—ড্রাইভারকো বোলাও, চৌধুরী লেন-মে যানে হোগা।

বিরক্তি সহকারে সিপাই ড্রাইভারকে ডেকে গাড়ি রেডি করতে বলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে দারোগাবাবু জিপে উঠে চললেন চৌধুরী লেন-এর দিকে।

চৌধুরী লেন থানা থেকে বেশ একটু দূরে। পুরনো ঘিঞ্জি অঞ্চল। অনেক গলি ঘুরে ঘুরে যেতে বেশ একটু দেরি হল।

কিন্তু সেখানে পৌঁছেও চৌধুরী লেন কোন্‌টা তা ঠিক করতে পারলেন না। শীতের রাত, সমস্ত পাড়া নিঝুম। কোন রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। কাকে জিজ্ঞেস করবেন? বার বার হর্ন মেরেও কোন ফল হল না। একটি সরু রাস্তা থেকে গাড়িটা পেছন দিকে

ফেরাতেই দেখা গেল কিছুটা দূরে একটি ছেলে গুটিসুটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এত রাতে এই ছেলেটি দাঁড়িয়ে কেন? দারোগাবাবুর মনে একটু সন্দেহ জাগল। চোর-টোর নয় তো?

একজন কনস্টেবল ফিস ফিস করে বলল—হুজুর, ও জরুর চোর হ্যায়। আর একজন কনস্টেবল বলল—ডাকু হ্যায়।

দারোগাবাবু বললেন—তোমরা গাড়ি থেকে নেমে ঐ ছোকরাটাকে ছুটে গিয়ে ধরো। দেখো যেন না পালায়।

কনস্টেবল দু'জন গাড়ি থেকে নেমে বেশ জোরেই ছুটতে লাগল। চোর ধরার বাহাদুরি তারা নিতে পারবে আজ। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তাদের মনের উৎসাহ দমে গেল। ছেলেটির একেবারে কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে তারা। এবার নির্ঘাৎ ধরে ফেলবে। হঠাৎ কোথায় চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেল ছেলেটি তা তারা বুঝতে পারল না। দু'জনেই বোকার মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

গাড়িতে বসে প্রতাপ পাকড়াশী অবাক হয়ে ব্যাপারটি দেখলেন। গাড়িটা তখন ঘুরিয়ে সোজা করা হয়েছিল। তিনি আরও অবাক হয়ে দেখলেন ঠিক সেই রকমই একটি ছেলে তাঁর গাড়ির সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক সেই রকমই পোশাক পরনে। এবার তার চেহারাটাও দেখতে পেলেন। চেহারাটি সুন্দর কিন্তু মুখের ভাব মলিন।

দারোগাবাবু ড্রাইভারকে বললেন—গাড়িটা চালিয়ে ওর কাছাকাছি নিয়ে যাও।

ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করল। গাড়িটা ছুটতেই ছেলেটাও কিন্তু ছুটতে লাগল। তারপর আর তাকে দেখা গেল না। হঠাৎ একটা বাড়ির সামনে এসে সে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল না কোথায় গেল তা বুঝতে পারলেন না ঝানু দারোগা প্রতাপবাবু।

তিনি সেই বাড়িটার সামনে এসেই জিপ থেকে নেমে পড়লেন।

এদিকে সেই কনস্টেবল দু'জন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সেখানে হাজির হয়েছে। তারা বলল—হুজুর, ডাকু ভাগ গিয়া।

ড্রাইভার বলল—ডাকু এই বাড়িমে ঘুসা হ্যায়।

বাড়ির দরজা জানালা সব বন্ধ। কোন লোকের সাড়াশব্দ নেই। ব্যাপারটা কিরকম যেন রহস্যজনক মনে হতে লাগল।

দারোগাবাবু নিজেই জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা মারলেন। বললেন—ভেতরে কে আছেন, দরজা খুলুন।

কয়েকবার ধাক্কা মারতেই একজন দরজাটা খুলে দিল।

দারোগাবাবু লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন—বাড়ির মালিক কে?

ঠিক সেই সময়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘুম জড়ানো চোখে সেখানে দাঁড়ালেন। পুলিশের লোক দেখে তিনি ঘাবড়ে গেলেন খুব। চোখের ঘুমও মুহূর্তে পালিয়ে গেল। তিনি কাঁপা গলায় জবাব দিলেন—আমি।

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—একটু আগে এই বাড়িতে কেউ ঢুকেছে?

ভয়ের মধ্যেও বিস্ময়ের ভাব জেগে উঠল বাড়িওয়ালার চোখে মুখে। জবাব দিলেন—না, কে ঢুকবে বাড়িতে? আমরা তো সব ঘুমচ্ছিলাম।

দারোগাবাবুর মনেও বিস্ময়ের ভাব জেগে উঠল। তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে জিজ্ঞেস করলেন—চৌধুরী লেন কোন্‌টা বলতে পারেন?

বাড়িওয়ালা কাঁপা গলায় জবাব দিলেন—এটাই চৌধুরী লেন।

দারোগাবাবু বললেন—যাক্ ভালই হল। রাস্তাটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে অনর্থক বিরক্ত করলাম। আচ্ছা, দশ নম্বর বাড়ি কোন্‌টা বলতে পারেন?।

বাড়িওয়ালা এবার রীতিমত ভীত ও হতভম্ব। তাঁর হাত পা কাঁপতে লাগল। অনেকটা রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—এ-এটাই দশ নম্বর।

এঁ্যা, বলেন কি? বিস্ময়ে ফেটে পড়লেন দারোগাবাবু। বললেন—তা হলে তো আপনাকে আরও একটু বিরক্ত করতে হবে। বলুন

তো, আপনার বাড়িতে কোন ঘটনা ঘটেছে কি না ?

সহসা বাড়িওয়ালার মুখের উপর যেন একটা কালো ছায়া পড়ে গেল। শুকনো গলায় তিনি বললেন—কি ঘটনা ? না, কোন কিছু ঘটেনি তো।

দারোগাবাবু বললেন—কিছুক্ষণ আগে আমি ফোন পেয়েছি, এই বাড়িতে একটি ছেলে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

বাড়িওয়ালার সারা শরীরটাই এবার থরথর করে কাঁপতে লাগল। বললেন—গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে একটি ছেলে ? এই বাড়িতে ? বলেন কি আপনি।

এবার একটু রুক্ষকণ্ঠেই দারোগাবাবু বললেন—হ্যাঁ, এই বাড়ির চিলে কোঠায়।

ততক্ষণে বাড়ির লোকজন জেগে উঠেছে। সবার মনেই কৌতূহল ও ভয়। দারোগাবাবু বললেন—আমরা চিলেকোঠাটা একবার দেখব। সেখানে যাবার সিঁড়িটা দেখিয়ে দিন।

বাড়ির লোকেরা উপরে যাবার পথ দেখিয়ে দিল। দারোগাবাবু একজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে চিলে কোঠায় গিয়ে উঠলেন। গিয়ে দেখলেন সত্যি একটি ছেলের মৃতদেহ চিলেকোঠার ছাতে ঝুলছে।

বাড়ির লোকেরাও পুলিশের পেছনে পেছনে সিঁড়ি বেয়ে চিলে কোঠার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছিল। তারা সকলেই চমকে গিয়ে বলে উঠল—একি ! দুলাল কখন গলায় দড়ি দিল ?

ব্যাপার দেখে সবাই স্তম্ভিত ও হতবাক।

দারোগার নির্দেশে কনস্টেবল গলায় দড়ি দেওয়া দেহটাকে খুলে নামিয়ে আনল। কাছেই একটা ছোট টুল উল্টে পড়েছিল, সেটাতে উঠে মৃতদেহ নামিয়ে আনতে খুব অসুবিধা হল না।

নিচে শুইয়ে দেওয়া হল দেহটাকে।

দারোগাবাবু ছেলেটার গায়ে হাত দিয়ে বুঝতে পারলেন, মারা গেছে। শরীরটা তখনও একদম ঠাণ্ডা হয়নি। একটু আগেও

হয়তো দেহে প্রাণ ছিল।

কিন্তু ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন প্রতাপ পাকড়াশী। বললেন—একি, এই ছেলেটিকেই তো একটু আগে রাস্তায় দেখলাম। ঠিক এই চেহারা, এই পোশাক। ওকেই তো এই বাড়ির সামনে ছুটে আসতে দেখলাম। ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার তো!

কনস্টেবল মোহন সিং বলল—হামলোক ভি এই লেড়কাকো দেখিয়েছে হুজুর। কাহা ঘুসিয়ে গেল।

অপর কনস্টেবল রামশরণ বলল—বহুত তাজ্জবকা ব্যাপার হ্যায় হুজুর। হাম ভি ইসকো দেখা হ্যায়।

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ছেলেটি আপনাদের কে হয়?

বাড়িওয়ালা জবাব দিলেন—আমার ভাগনে। ওর মা নেই। আমার বাড়িতেই থাকে।

দারোগাবাবু প্রশ্ন করলেম—আপনার নাম?

বাড়িওয়ালার জবাব—ভবনাথ দত্ত।

দারোগাবাবু বললেন—আচ্ছা ভবনাথ বাবু, কাছাকাছি কোন ডাক্তার আছে?

ভবনাথবাবু বললেন—না, কোন ডাক্তার নেই তো।

বাড়ির একটি ছোট্ট মেয়ে বলে উঠল—কেন, ডাক্তার সুনীল কাকু তো রয়েছে। আমি ডেকে নিয়ে আসব?

দারোগাবাবু বললেন—কাউকে সঙ্গে নিয়ে তুমি এক্ষুনি যাও। ডাক্তারবাবু যেন তাড়াতাড়ি আসেন।

একজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটি তখনই ডাক্তার আনতে চলে গেল। দারোগাবাবু তাঁর রিপোর্ট লিখতে শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে গেল। বাড়ির ছেলে মেয়ে বউ অনেকেই কাঁদতে লাগল। শুধু কান্না নেই বাড়ির মালিক ভবনাথ দত্তর চোখে। তিনি যেন পাথর হয়ে গেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার সুনীল দাস এলেন। তিনি ছেলেটির

মৃতদেহ পরীক্ষা করে বললেন—'ডেড'।

দারোগাবাবু তাঁর প্রাথমিক রিপোর্ট লেখা শেষ করে লাসটাকে গাড়িতে তোলার হুকুম করলেন। তারপর আবার রিপোর্ট খাতা খুলে ভবনাথ বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনাদের সঙ্গে ছেলেটির কি কোন ঝগড়াঝাটি হয়েছিল ?

—না।

—কেউ কি ওকে ভর্ৎসনা করেছিলেন ?

—না।

—আপনিও চলুন থানায় আমাদের সঙ্গে। ওখানেও একটা ডায়েরী লেখাতে হবে। লাস পোস্টমর্টেম করানো হবে—আপনার একটা ওইটনেস চাই।

গল্প এখানেই শেষ হল না। ছেলেটির দেহ পোস্টমর্টেম করা হল। পরীক্ষায় দেখা গেল, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলেও শরীরে অনেক নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে। মৃত্যুর বেশ কিছুক্ষণ পূর্বে ভয়ানক প্রহার করা হয়েছে ছেলেটিকে।

মামলা চলল। একপক্ষে পুলিশ, অন্যপক্ষে ভবনাথ দত্ত। মামলায় প্রমাণিত হল, ভবনাথের আশ্রয়ে থেকে ছেলেটি খুবই দুর্দশা ভোগ করত। মাঝে মাঝেই নানা অজুহাতে নির্দয় ভাবে প্রহার করা হত তাকে।

ছেলেটির মা নেই। ওর বাবা সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবার আগে টাকা পয়সা সব কিছু দিয়ে গেছে ভবনাথকে। সে-সব ভবনাথের কাছে গচ্ছিত আছে।

ছেলেটি হয়তো নিজেই গলায় দড়ি দিয়েছে। কিন্তু দিয়েছে অতিরিক্ত দুঃখ ও ঘৃণায়। সেজন্য ভবনাথই দায়ী। থানার দারোগা প্রতাপ পাকড়াশী কিভাবে ছেলেটির ফাঁসীর খবর পেয়েছিলেন এবং কিভাবে বাড়ির সন্ধান পেয়েছিলেন, সে-সব ভৌতিক কাহিনী সবই প্রকাশ করেছিলেন আদালতে। ব্যাপারটি ভৌতিক হলেও বিচারক এর ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু ফোনটি রাত বারোটার সময়

কোত্থেকে কে করেছিল তার কোন রহস্যভেদ করা যায়নি।

মামলায় ভবনাথের চার বছর জেল হয়েছিল। কিন্তু জেল ভোগ তাঁকে পুরোপুরি করতে হয় নি। এক বছর পার হতে না হতেই একদিন জেলখানার ভেতর ভবনাথকে মৃত অবস্থায় দেখা গেল। তাঁর গলায় ছিল দু'হাত দিয়ে টিপে ধরার দাগ আর চোখে মুখে ছিল আতঙ্কের চিহ্ন।

বোধ হয় দুলালের অশরীরী আত্মাই তাঁকে গলা টিপে হত্যা করেছিল।

(এক)

গাঁয়ে এসেছি ডাক্তারি করতে।

সরকারের সঙ্গে সেই রকমই চুক্তি হয়েছিল বটে, কিন্তু চাকরি করতে এসে একি জ্বালায় পড়লাম ? মাইনের টাকাগুলির জন্য মায়া ছিল বটে, কিন্তু তাই বলে নিজেকে বিকিয়ে দেব নাকি এখা ই এসে ? সরকারের সঙ্গে এমন তো চুক্তি ছিল না। অথচ হচ্ছে। আমাকে সবাই যেন লুটেপুটে খাচ্ছে।

ব্যাপারটা তা হলে ভাল করে বুঝিয়ে বলি।

বর্ধমানের রসুলপুর গ্রাম হিসেবে খারাপ র। কিন্তুআমার কাজটাই এখন খারাপ বলে মনে হচ্ছে। রসুলপুর আঁ জেনে শুধু সেই গ্রামেরই নয়, চার পাঁচ ক্রো দূরের গাঁ থেকে লোক আসে আমার কাছে। কিন্তু আ ব্যাপার, যখন রোগীআমার কাছে আসবে তখন তার একে শেষ অবস্থা।

বুঝতে পারি, সরকারী ডাক্তারের ওষুধের উপর গ্রামের কদের ততটা ভরসা নেই যত ভরসা আছে ঝাড়-ফুঁক আর টকা

ওষুধের উপর। ফলে আমার যখন ডাক পড়ে তখন গিয়ে দেখি হয় রোগী শুষছে আর নয়তো শেষ হয়ে গেছে। আমার তখন আর কি করার থাকতে পারে? আমি তো ফুসমন্তর জানি না আর অলৌকিক শক্তিরও অধিকারী নই। কাজেই ওদের হাবভাব দেখে বুঝতে পারি আমার উপর আস্থা ওদের ধীরে ধীরে কমে আসছে। মুখে তারা কিছু প্রকাশ করে না বটে কিন্তু তাদের মুখের উপর তার অস্পষ্ট ভাব দেখা যায়।

এই হল আমার একটি জ্বালা। তা ছাড়া আরও একটি আছে।

কোনদিন হয়তো রাত বারোটা বেজে গিয়েছে। এমন সময় তিনটে গ্রাম ছাড়িয়ে একটা জায়গা থেকে আমার ডাক এল। তখন কি করি? গ্রামের রাস্তাঘাটের যা অবস্থা! তার উপর ঝোপ জঙ্গল—নানা বিপদ আপদের ভয়। যাঁরা নিত্য শহরের পাকা-রাস্তায় ট্রামে বাসে বা ট্যাক্সিতে চলাফেরা করেন তাঁরা এই অসুবিধার কথা মোটেই উপলব্ধি করতে পারবেন না। তার উপর যদি অন্ধকার রাত হয় তা হলে তো কথাই নেই। জঙ্গল আর বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হয়তো পচা ডোবার মধ্যেই পা ডুবে যাবে। তখন কি অবস্থা! অত রাতে এত দূরের পথে যেতে হলে প্রাণ হাতে নিয়েই যেতে হবে। অথচ উপায় নেই। তিন বছরের চুক্তিতে সরকারের চাকুরে হয়ে এসেছি—কর্তব্য পালন আমাকে করতেই হবে। হায়রে, কি কপাল!

যাই হোক, আমার আসল বক্তব্যটা কিন্তু এখনও বলা হল না। অবশ্য ভূমিকা না করলে যে ঘটনাটা বলতে যাচ্ছি তা কেউ বুঝতে পারবে না, বিশ্বাস করা তো দূরের কথা।

সেদিনও ছিল অন্ধকার রাত্রি।

বসেছিলাম নিজের চেম্বারে। শহর থেকে অনেক ওষুধ পত্র, ব্যাণ্ডেজ ও রোগীর পথ্য জাতীয় জিনিস এসেছে। সেগুলি লিস্টের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে তুলে রাখছিলাম আলমারিতে।

বাইরে শোঁ শোঁ করে ঝড়ো হাওয়া বইছিল। আকাশে মেঘের

ঘটা ছিল, কিন্তু তখনও বৃষ্টির ফোঁটা পড়েনি। ঝড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ ঘরে বসেও শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম- এ সময় আর যেন কোন উপদ্রব না হয়।

কিন্তু ভাবতে না ভাবতেই উপদ্রব এসে হাজির। বাইরে সজোরে কড়া নাড়ার আওয়াজ পেলাম।

জানি, এই সময়ে কড়া নাড়ার কি উদ্দেশ্য। ইচ্ছা না থাকলেও দরজা খুলতে বাধ্য হলাম।

কিন্তু একি! দরজাটা খুলেই চমকে উঠলাম। দেখলাম একটা কাটা মাথা শূন্যে দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

একবার ভাবলাম দরজাটা বন্ধ করে দিই।

কিন্তু না, আমি শহুরে ছেলে, অত সহজে ভূতকে বিশ্বাস করি না। তাই ভাল করে লণ্ঠনটা তুলে লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এবার মনে হল, শরীর ওর ঠিকই আছে। কালো পোশাক পরার ফলে অন্ধকারে সেটা ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। লোকটার চোখ দুটো অসম্ভব রকম লাল, আর চোখের মণি-দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। গলাটা বেশ ফোলা। থাইরক্সিন বেশী হলে রোগীদের মধ্যে যে প্রক্রিয়া দেখা দেয়, আমার মনে হল এর মধ্যেও যেন সেরকম কিছু দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই লোকটা আসবার আর সময় পেল না? এ কি উৎপাত!

আমি বলতে চাইছিলাম—এই অবস্থায় তুমি এত রাত্রে এসেছ কেন? কাল সকালে এসো।

কিন্তু কথাটা মনের ভেতরই রয়ে গেল। লোকটা অস্বাভাবিক ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল—ডাক্তারবাবু, আপানাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।

আমি চমকে উঠলাম। বলে কি লোকটা? ওর নিজের অসুখ নয়, অন্যের অসুখের জন্য আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে এসেছে?

আমি ভয়ানক বিরক্তির সঙ্গেই বললাম—দেখছ না, আকাশের কি অবস্থা! এই সময়ে কেউ আসে? কোথায় যেতে হবে? আমায়

ডাকার কি আর সময় পাওনা তোমরা ?

লোকটা হাতজোড় করে বলল—ডাক্তারবাবু, আমি নিজেও বড় অসুস্থ ছিলাম বলে আসতে পারিনি। আমার মালিকের বড় বেমার। আপনাকে যেতেই হবে ডাক্তারবাবু। বেশি দূরে নয়, কাঞ্চনপুর।

আমি বললাম—কাঞ্চনপুর! সে কি খুব কাছে ?

যদিও কোনদিন ঐ অঞ্চলে যাইনি, তবু লোকের মুখে নাম শুনেছি। বললাম—ওখানকার পথ ঘাট নাকি ভয়ানক খারাপ। এই দুর্যোগের রাতে কিছুতেই সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। কাল সকালে এসো, যাব।

লোকটা এবার হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার পায়ের উপর। হুজুর, আপনিই আমাদের মা বাপ। মালিকের আজ দু'দিন থেকে জ্ঞান ফিরছে না। শরীরের লক্ষণগুলোও ভাল ঠেকছে না। আপনি না গেলে সে মারাই যাবে।

আমি অনেকবার আপত্তি করেও শেষকালে যাওয়াই ঠিক করলাম।

বাড়িতে থাকি আমি আর রঘু নামে একজন ভৃত্য। সে আমাকে রেঁধে বেড়ে দেয়, বাজার করে, ফাই ফরমাস খাটে। ওর বাড়ি অনেক দূর বলে আমার সঙ্গেই থাকে, ছোট ঘরটায় শোয়। সে আমাকে রাতের খাবার খাইয়ে নিজেও খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছিল। ওকে আর বিরক্ত করলাম না। আমি তৈরি হয়ে নিয়ে ওকে শুধু দরজাটা বন্ধ করে দিতে বলে রওনা হলাম।

কাঞ্চনপুর এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে জিব বেরিয়ে যাবে। সাইকেলটা থাকলে তবু একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া যেত। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ সাইকেলটা অচল হয়ে আছে। সারানোও যাচ্ছে না। ঝড়ো রাত আর গ্রাম্য রাস্তা—এসব মনে পড়লেও গা শিউরে ওঠে। তবু লোকটার কাকুতি মিনতিতে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে নিলাম পাঁচ সেলের একটা টর্চ আর একটা লাঠি। কাঁধে নিলাম হ্যাভারস্যাকের মধ্যে ওষুধপত্র আর ডাক্তারি সরঞ্জাম।

পথে নামতেই ঝোড়ো হাওয়ার দাপট যেন আরও বেড়ে গেল।

হাওয়ার সঙ্গে উড়ে আসছে ধুলো, গাছের শুকনো পাতা এবং আরও কত সব জঞ্জাল। ওসব অগ্রাহ্য করেই এগিয়ে চললাম। লোকটা আমার পেছনে পেছনে আসতে লাগল। আমি টর্চের আলো ফেলে এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়ের দিকেও টর্চ ফেলতে হচ্ছিল। যদি সাপখোপ কিছু থাকে!

মিনিট পনেরো হেঁটেছি ততক্ষণে। কারো মুখে কোন কথা নেই। কথা বলবই বা কি করে, যা হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ তারপরই হঠাৎ গায়ে বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগল। বৃষ্টি নেমেছে। যাক্, সব দিকই রক্ষা হল তা হলে। আর যেতে হবে না—যাওয়া সম্ভবও নয়। আমি অনেকটা স্বস্তি নিয়েই পেছনে লোকটার দিকে তাকালাম।

কিন্তু ওমা! কোথায় লোকটা? একটা ভাসমান মুণ্ড যেন আমার পেছনে পেছনে এগিয়ে আসছে, ঠিক যেমনটা প্রথমে দেখেছিলাম। আবারও ভুল দেখলাম?

টর্চটা ওদিকে ফেলতেই দেখা গেল—লোকটার কালো ধড়টাও আছে। মনটা কেমন যেন খুঁতখুঁত করে উঠল আমার। আচ্ছা জ্বালা তো! প্রথমেই লোকটার শুধু মুণ্ড দেখা যায়, ধড় দেখা যায় না। ভাল করে তাকালে অস্বাভাবিক ধড়টা দেখা যায়। যা হোক্, মনের ভাব গোপন করে লোকটার উদ্দেশ্যে বললাম—কি হে, বৃষ্টি যে নামল!

কথা শেষ হল না। হঠাৎ অন্ধকারকে চিরে খান খান করে দিয়ে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে চারধার কাঁপিয়ে পড়ল প্রচণ্ড বাজ। জঙ্গলের কাছেই কোথাও বাজ পড়েছে। এত কাছে যে তার শব্দে আমার কানদুটো যেন কালা হয়ে গেল।

আমি ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম।

আমার চোখের সামনেই একটা গাছে আগুন ধরে গেল। আর সেই আগুনের আলোতেই দেখতে পেলাম—না, একটুও মিথ্যে নয়—দেখতে পেলাম ঠিক আগুনের কুণ্ডর মতই শূন্যে নেচে বেড়াচ্ছে আমার চারধারে গোটা দশেক মানুষের কাটা মুণ্ড। মুণ্ডগুলো যেন

জ্যান্ত—হাসছে, বিদ্রূপ করছে, ভয়াবহ কি সব ইঙ্গিত করছে। আমার দেহের রক্তপ্রবাহ যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল। জঙ্গলের রাস্তায় ভেজা মাটির উপর পড়ে গেলাম। পড়তে পড়তে শুনতে পেলাম বৃষ্টি ঝরছে ঝম ঝম করে।

কড় কড় শব্দে আবার একটা বাজ পড়ল।

কেঁপে উঠল মাটি।

জঙ্গলের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। জ্ঞান হারাবার মুখেই আচমকা যেন দেখতে পেলাম—জঙ্গলের আগুনটা বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই করছে।

(দুই)

কখন চোখ মেলেছি খেয়াল নেই। চারধার তখনও বেশ অন্ধকার। কাদের যেন ফিসফিসানি কথা কানে আসছিল। বাইরে তখনও বৃষ্টির ঝম ঝম শব্দ আর বাজের কড় কড় আওয়াজ।

এ আমি কোথায়? কোন ঘরের মধ্যে কি? কাছেই যেন একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। আমার চারধারের পরিবেশ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

প্রথমে চিন্তা করতে চেষ্টা করলাম কি হয়েছিল। তারপর একে একে সব মনে পড়ল। আমাকে ঘিরে কাটা মুণ্ডগুলোর নাচের কথা মনে পড়তেই একটা চিনচিনে প্রবাহ যেন আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। সত্যই কি আমি অমন কিছু দেখেছি? আমার যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। অন্ধকারে আমাকে ডাকতে আসা লোকটার মুণ্ডটাকেই আগে দেখে চমকে উঠেছিলাম বলে কি আমার মাথায় অমন একটা উদ্ভট চিন্তা বাসা বেধেছিল?

তারপর কি হল? কে আমাকে নিয়ে এল এখানে?

হঠাৎ অনুভব করলাম গলাটা আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একটু জলের বড় প্রয়োজন। আমি উঠতে চেষ্টা করলাম। এবার

বুঝতে পারলাম আমি একটা আরামদায়ক খাটের বিছানায় শুয়ে আছি। কিন্তু এ কোথায়, কার বিছানা ?

—ডাক্তারবাবু ভাল আছেন ?

ডাক শুনে আমি চমকে উঠে দেখলাম—সেই লোকটা, যে আমাকে আনতে গিয়েছিল। তার হাতে একটা হ্যারিকেন। হ্যারিকেনের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। সেই আলোতেই ভাল করে চারপাশটা এক নজরে দেখে নিলাম। বেশ বড় ঘর। দেওয়ালে বড় বড় কুলুঙ্গি রয়েছে। ঘরের যাবতীয় আসবাবে যেন একটা পুরনো আভিজাত্য ছড়ানো। এটা একটা বনেদী ঘর বলেই আমার মনে হল। কিন্তু জায়গাটা কোথায় !

—ডাক্তারবাবু ভাল আছেন ?

লোকটা আবার একই প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ ভাল আছি। ঘাড় নাড়লাম আমি। আড়চোখে দেখেও নিলাম লোকটাকে। না, এখন ধড় সমেত মাথা ভাল করেই দেখা যাচ্ছে। যাক্, একটু নিশ্চিন্ত হলাম।

—একটু জল দিতে পার ?

—নিশ্চয়ই। বলেই লোকটা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই এক গ্লাস জল নিয়ে ফিরে এল আবার। জল খেয়ে বুঝলাম ওর মধ্যে গোলাপ জল মেশানো রয়েছে।

—এটা কোথায় তুমি এনেছ আমাকে ?

—কাঞ্চনপুর রাজবাড়িতে ডাক্তারবাবু।

—কাঞ্চনপুরে রাজবাড়িও আবার আছে নাকি ? এমন কথা শুনিনি তো ?

—কাঞ্চনপুর রাজবাড়ীর নাম শোনেন নি ? লোকটা যেন একটু ব্যঙ্গ ভরা হাসি হেসে উঠল।

এবার আমারই লজ্জা হল একটু। সত্যি তো, আমি তো এখানে এসেছি মাত্র সাত মাস। এত সব জানাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জিজ্ঞেস করলাম—কই, তোমাদের রোগী কোথায় ?

লোকটির চোখেমুখে যেন বিস্ময় ফুটে উঠল। সে বলল—সেকি, এখনই রোগী দেখবেন ?

আমি বললাম—এক্ষুনি, মানে এই মুহূর্তে।

লোকটা বলল—আপনার শরীর হয়তো ভাল নেই ডাক্তারবাবু। তাই বলছি আজকে না হয় থাক—

আমি বাধা দিয়ে বললাম—না না, শরীর আমার ভালই আছে। আমি এখনই দেখব। বাজটা বড় কাছে পড়েছিল বলে তার শব্দে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। ও কিছু নয়।

লোকটা দেখলাম আমার কথা শুনে কি রকম যেন হাসল। ওর হাসির ভঙ্গিটা আমার কাছে মোটেই ভাল লাগল না। কিন্তু লোকটা জায়গা ছেড়ে নড়লও না একটু। তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। আমি তখন বললাম—কি হে, শুনছ ? আমাকে তোমাদের রোগীর কাছে নিয়ে চল।

লোকটা এবার আমাকে সত্যই অবাক করল। বলল—না ডাক্তার-বাবু, তা পারব না। মালিক আজ কারো সামনে বেরোবেন না। শত রোগ হলেও না।

আশ্চর্য কাণ্ড! গাঁয়ে এসে নানারকম অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। সেজন্য সরকার বাহাদুরকে ধন্যবাদ। কিন্তু এমনটা যে শুনব তা আশা করি নি। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল আমার। অতি কষ্টে নিজকে সামলে নিলাম। বললাম—সে কি, আমার কাছে গিয়ে যে বললে রোগীর খুব খারাপ অবস্থা।

লোকটা চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না। জিজ্ঞেস করলাম—কে তোমাদের রোগী ? কি হয়েছে তার ?

লোকটা এবার জবাব দিল—আজ্ঞে রোগী আমাদের মালিক জমিদারবাবু।

—কি হয়েছে তাঁর ?

—আজ্ঞে তা বলতে পারব না।

এরূপ অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় আমার নতুন নয়, গাঁয়ের লোকেরা সত্যিই বোঝে না কার কি হয়েছে। আমি একটু রাগত ভাবেই

বললাম—আমাকে কেন মিছেমিছি ঝড়জলের মধ্যে এতদূর নিয়ে এলে! কাল দিনের বেলা আনতে গেলে না কেন?

লোকটা সে কথার কোন জবাব দিল না। বলল—এসে যখন পড়েছেন তখন আর কি করবেন? কাল সকালে রোগী দেখে রাত্রে ফিরবেন। এখানে আপনার থাকার কোন অসুবিধা হবে না।

আর কি করা যায়? রাত্রে এখানে থাকা ছাড়া আর উপায় কি! এই দুর্যোগের রাত্রে বাড়ি ফেরাও যাবে না। বৃষ্টি এখনও পড়ছে, বাজ পড়ার শব্দও মাঝে মাঝে কানে আসছে। অগত্যা লোকটার কথাতেই আমাকে রাজী হতে হল।

মনের ভয় ও সন্দেহ তখনও আমার কাটে নি।

অবশ্য আদর যত্নের কোন ত্রুটি হল না। লোকটাই আমার হাত মুখ ধোয়ার জলের ব্যবস্থা করে দিল। খাবার দাবার ব্যবস্থাও করতে চেয়েছিল। কিন্তু এদের হাতে খেতে আমার ইচ্ছা হল না। আমার হ্যাবারস্যাকে শুকনো খাবার দাবার থাকে। বোতলে জলও থাকে। কারণ রোগী দেখতে দেখতে রাত কাবারও মাঝে মাঝে হয়ে যায়। তাই এই ব্যবস্থা। আমার নিজের খাবার খেয়ে সেই খাটের নরম বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আলোটা কে যেন এসে নিভিয়ে দিয়ে গেল।

বাইরে তখনও ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। ঘরের মধ্যে বেশ একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব।

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। মনে হল আমার চারপাশে কারা যেন কথা বলছে। কি বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না। অন্ধকারের মধ্যেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকাতে লাগলাম।

একি! একি! এরা সব কারা আমার চারধারে? একজনেরও ধড় নেই, শুধু মাথা। মাথাগুলো কেউ যেন ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলেছে। চোখগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে সেই মাথা থেকে। একটা নয়, দুটো নয়, অনেক—অনেক। আমার খাটটাকে

ঘিরে শূন্যে তারা স্থির রয়েছে। সবারই ঠিকরে পড়া জ্বলন্ত চোখগুলো যেন তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

কোন কোন মুখ যেন হেসে উঠল। পৈশাচিক সেই হাসির শব্দ। বীভৎস!

ভয়ে আমি যেন কাঠ হয়ে গেলাম—একেবারে মরার মত নিস্পন্দ। আমার চোখ দুটো অসার হয়ে আপনিই বুজে এল।

এভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না।

—ডাক্তার বাবু!

—ডাক্তার বাবু!!

—ডাক্তার বাবু!!!

শুনতে পেলাম আমাকে কারা যেন ডাকছে। অনেকগুলো কণ্ঠস্বর একসঙ্গে। কর্ণেন্দ্রিয় ছাড়া মস্তিষ্কের সব অংশ যেন তখন আমার বিকল হয়ে গেছে। শুধু শুনতে পাচ্ছিলাম ওরা কি বলছে। আমি সাড়া দিতে পারছিলাম না। চোখও খুলতে পারছিলাম না।

ওরা বলছে—ডাক্তারবাবু, দোহাই আপনার। আমাদের কাটা মুণ্ডগুলো দেহের সঙ্গে জুড়ে দিন। জুড়ে দিন ডাক্তারবাবু, জুড়ে দিন। কতদিন আর এভাবে ঘোরা যায়?

—ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!

আমার চারপাশের পৃথিবী যেন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসতে চাইছে। শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরাই যেন অবশ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

এমন সময় একটা ভারী গলা শুনতে পেলাম—না না ওটা নয়। ডাক্তারবাবু, আগে আমাদের মালিককে বাঁচান। তাঁর মুণ্ডটাকে আমারই কেটেছিলাম। বাঁচান তাঁকে, বাঁচান ডাক্তারবাবু।

কয়েকটা কাটা মাথা যেন বাধা দিল—তার দরকার নেই ভাই, তার কোন দরকার নেই। মাথা জোড়া লাগলে আবার তা আমরা কেটে ফেলব। ঐ পিশাচটা আমাদের কি ভাবে মেরেছে? কি ভাবে আমাদের মুণ্ডগুলো ধড় থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। মনে নেই—মনে নেই সে সব কথা?

তার জবাবও পাওয়া গেল। কয়েকটা কাটা মাথা বলে উঠল—হ্যাঁ, মনে আছে। আমরা ভুলি নি। আমরা ভুলি নি।

একটা হাসির রোল উঠল চারদিক থেকে।

এমন সময় আর একটা গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল—তিন নম্বর সওয়ালের উত্তরটা জেনেছ ? তিন নম্বর সওয়াল ?

এবার একসঙ্গে কয়েকটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ঠিক,ঠিক। তিন নম্বর সওয়াল। তিন নম্বর সওয়াল। ডাক্তার, তিন নম্বর সওয়ালের উত্তরটা বলতে পার ? তিন নম্বর সওয়ালের উত্তর চাই।

চারধার থেকে সেই গুঞ্জন যেন বাড়তে লাগল—তিন নম্বর সওয়াল ! তিন নম্বর সওয়াল ! উত্তর চাই, উত্তর চাই ! ডাক্তার, বাঁচাও আমাদের। আমরা সবাই মরব, মরব এক সঙ্গে। ডাক্তার—ডাক্তার—

এবার বুঝি আমার দেহের সব ইন্দ্রিয়গুলো সতেজ হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। আমার মধ্যে অনুভূতিগুলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে প্রবেশ করছিল।

হঠাৎ একটা গুরু গম্ভীর স্বর শুনলাম। এ স্বরটা যেন অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা।

ডাক্তার....ডাক্তার ! সরে যাও সবাই, সরে যাও। এখানে কি করছ ? ডাক্তার, তোমার রোগী দেখতে এস। ডাক্তার, ডাক্তার—শুনছ ? তোমার রোগী। অনেক দিন ধরে ধড় আর মাথাটা আলাদা হয়ে পড়ে আছে। জুড়ে দাও ওটা। দিতে পারলে আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে দেব। চল ডাক্তার, চল।

একটা গরম হলকা যেন আমার দিকে ছুটে এল। আমার মনে হল আমি যেন ভাসছি। ভেসে ভেসে চলেছি কোন অজানার দিকে। চারপাশ থেকে নানা কথা ভেসে আসছে—ডাক্তার, ডাক্তার। আমাদের ভুলো না। বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও।

....তিন নম্বর সওয়াল। তিন নম্বর সওয়াল !!

না, এর পর আর আমার কিছু মনে নেই। সমস্ত চেতনা তখন

আমি যেন হারিয়ে ফেলেছি।

চোখ কান সব তখন আমার বন্ধ।

তারপর ?

(তিন)

চোখ যখন মেললাম, তখন দেখি ঘরের এক কোণে সকালের আলো ঢুকেছে। ঘরের সবক'টা জানালাই বন্ধ। শুধু একদিকের একটা জানালা একটুখানি খোলা। তার ভেতর দিয়েই ঢুকছে ভোরের একটুখানি আলো।

ঘরে একটা অসম্ভব ভ্যাঁপসা গন্ধ। মেঝেতে পুরু ধূলার আস্তরণ। সেই ধুলা মাখা মেঝের উপরেই পড়ে আছি। যে ঘরে কাল রাতে ছিলাম এ ঘর সে ঘর নয়। ঘরে অন্য কোন প্রাণীও নেই !

শরীরটাকে টেনে তুলতে গিয়ে বুঝলাম ভীষণ ভারী বোধ হচ্ছে। সারা দেহটা আড়ষ্ট। ঘাড়ের কাছে, হাতে পায়ে, মাথায় ব্যথা অনুভব করলাম। তবু উঠলাম। অতিকষ্টে টেনে তুললাম নিজেকে। উঠে দাঁড়ালাম।

আমি যে একটা যমপুরীর মধ্যে এসে পড়েছি তা বুঝতে মোটেই দেরি হল না সুন্দর সাজানো ঘর থেকে কিভাবে কখন এই ঘরে এসে পৌঁছলাম সেটা আমার কাছে এখন একটা অজ্ঞাত রহস্য।

পালাতে হবে এখান থেকে, পালাতে হবে।

কাল রাতের কথা চিন্তা করলে বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। টলে পড়তে চায় দেহটা। উঃ, কি ভয়ানক ! বিশ্বাস হচ্ছে না কালকের সব ঘটনাগুলো।

জানালাগুলো খুলে দিলাম। বাইরের সোনালী আলোয় ঘর ভরে গেল। তার সঙ্গে ঢুকে পড়ল এক ঝলক মুক্ত বাতাস। আঃ, নিশ্বাস নিয়ে কি তৃপ্তি !

খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। সেখানে

মেঘের চিহ্নমাত্র আর নেই। দিনের আবহাওয়াও পরিষ্কার। তবে কাল প্রবল বৃষ্টির ফলে তখনও একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। জানালাগুলোর গরাদ নেই। গরাদহীন একটা জানালা থেকে মাথাটা বের করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাটা যদি একটু ঠাণ্ডা হয়।

মাথাটা সত্যি একটু ঠাণ্ডা হল। কিন্তু বাইরের দৃশ্য দেখে বুকটা কেঁপে উঠল হঠাৎ। ইস্, এমন জঙ্গলাকীর্ণ বাড়িটাতে এলাম কি করে? চারদিকে ভরা জঙ্গল। যতদূর চোখ যায় জঙ্গল ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। জায়গায় জায়গায় মাটি দেখা যায়, কিন্তু সেখানে বৃষ্টির জল জমা হয়ে আছে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম বাড়িটা তিনতলা। আমি তিন তলাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। জরাজীর্ণ বাড়ি। দেওয়াল ফুঁড়ে অসংখ্য অশ্বত্থ গাছ রীতিমত বড় হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চারধারটা বেশ কিছুক্ষণ দেখলাম।

ধীরে ধীরে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠছি। অবশ্য বুকটা তখনও ধুকপুক করছে। এখন তো ভয়ের কোন কারণ নেই। এখন প্রকাশ্য দিবালোক। যাদের কাল রাত্রে দেখেছিলাম তারা যদি সত্যিই অশরীরী আত্মা হয় তা হলে তারা কখনই সকালে বেরোবে না।

এখন আমার প্রথম কর্তব্য হবে, যেমন করেই হোক, এ যমপুরী থেকে মুক্তি পেতে হবে। বেশি দেরি করা চলবে না, এখনই।

ঘরের দরজা বন্ধ। একটু টানতেই দরজাটা খুলে গেল। ধীরে ধীরে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

হঠাৎ মনে পড়ল কাল রাত্রের একটি কথা—তিন নম্বর সওয়াল! তিন নম্বর সওয়ালের উত্তর চাইছিল কারা যেন? কি উত্তর তিন নম্বর সওয়ালের? তিন নম্বর সওয়ালটাই বা কি? জানি না, জানি না, জানি না। কিন্তু... কিন্তু জানতে হবে। অন্ততঃ এই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে জানতে হবে।

হঠাৎ কেন জানি এই জানবার নেশাটা আমাকে পেয়ে বসল।

আগের ঘরটা ছেড়ে এসে পড়লাম আর একটা ঘরে। এ ঘরটাও আগের ঘরটার মতই বড়। জানালাগুলো সব বন্ধ। মেঝেতে পুরু ধুলোর আস্তরণ। এ ঘরে যে কেউ থাকে না এটা তারই প্রমাণ। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা চামচিকে আমার গা ঘেঁষে উড়ে গেল। বুকটা ধ্বক করে উঠল একবার। তারপর নিজেকে সামলে নিলাম। ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম অন্য একটা ঘরে।

কাল রাতে যে ঘরে ছিলাম সে ঘরে আমার হ্যাভারস্যাক আর টর্চটা ছিল, এখনও বোধ হয় সেখানে রয়ে গেছে। কি করে পাব সেগুলি? আর সেই ঘরটাই বা কোথায়? আশ্চর্য! সব আশ্চর্য! এত বড় ভৌতিক কাণ্ডটার সবটাই এখনও আমার ঠিক স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। আমি যে কলকাতার ছেলে, মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাস করে বেরিয়েছি। আমি কি করে এমন ভৌতিক কাণ্ড বিশ্বাস করি? কিন্তু না করেই বা পারছি কোথায়? তা হলে কি করেই বা আমি এখানে এলাম?

আবোল তাবোল চিন্তা করতে করতে তিন চারটে ঘর পেরিয়ে গিয়েছি। এবারেরটায় যেই ঢুকেছি অমনি কি যেন একটা জিনিস আমার পায়ে ঠেকল। পায়ে লাগতেই সেটা গড়িয়ে গেল অন্যদিকে। এমন সময় হঠাৎ কি রকম যেন একটা শব্দ হল। মনে হল কে যেন হেসে উঠল বিশ্রী ভাবে হিঃ হিঃ শব্দ করে।

ঘরটা দিয়ে বড্ড বেশি ভ্যাপসা গন্ধ বেরুচ্ছে। অন্ধকারটাও যেন এখানে বেশি জমাট বাঁধা। হাসিটা চারধার থেকে যেন প্রতিধ্বনি তুলল। আতঙ্কে শিউরে উঠলাম আমি। ছুটে গিয়ে একটা জানালা খুলে দিতেই বাইরের ঝকঝকে আলোর সঙ্গে এক ঝলক টাটকা হাওয়া ঢুকে পড়ল ঘরে।

আঃ, বাঁচলাম!

কিন্তু পায়ে কি ঠেকল?

সূর্যের আলোয় পরিষ্কার দেখা যায় ঘরের মেঝেটা। সেদিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। মানুষের মাথার খুলি। একটা নয়, দুটো

নয়—দশ বারোটারও বেশি। ঘরের কোণে জটলা পাকিয়ে বসে আমার দিকে ভয়ানক ভাবে তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিতে যেন তারা রয়েছে। উঃ, দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যেন আমার।

প্রচণ্ড একটা লাফ মেরে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। না না না। এখানে আমার একমুহূর্ত আর থাকা চলবে না। পালাতে হবে আমাকে এক্ষুনি। ঘর থেকে বেরিয়েই আমি প্রায় দৌড়ে চললাম। পেছন থেকে শুনতে পেলাম সেই বিশ্রী হাসির শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। প্রচণ্ড ভাবে কারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে।

আমি দু'কানে আঙুল পুরে দিয়েছি তখন। ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেলাম। দেওয়াল ধরে সামলে নিলাম নিজেকে। এখানটাও বেশ অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকারেও বুঝতে অসুবিধা হল না আমি সিঁড়ির উপর এসে পড়েছি। এক এক সঙ্গে তিন চারটে করে সিঁড়ি পার হয়ে দোতলায় এসে পড়লাম। সামনেই একটা ঘর। কোন কিছু চিন্তা না করেই ঘরটার ভেতর ঢুকে পড়লাম।

একি! ঘরটায় ঢুকেই চমকে উঠলাম আমি। এটা কালকের সেই ঘর যেখানে আমি প্রথম এসেছিলাম। ঐ তো আমার টর্চ আর হ্যাভারস্যাক।

কিন্তু খাটটা কোথায় দেখতে পেলাম না।

হ্যাভারস্যাক আর টর্চটাকে চেপে ধরে আমি তখন ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছি। সেই বিশ্রী হাসির শব্দ তখন আর আমার কানে আসছে না।

এই ঘরটায় বেশ আলো বাতাস আছে—কারণ সামনেই বারান্দা। এই ঘরটায় এসে যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলাম। ভয়ের ভাবটাও যেন একটু কমে গেল। মেঝের উপর বসে পড়েছিলাম, এবার উঠে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, চলে যাবার আগে বাড়িটা আবার ঘুরে দেখব। মন থেকে ভয় মুছে গিয়েছে আমার। তার বদলে মনে একটা দুর্জয় সাহস আর দৃঢ়তা দেখা দিয়েছে। মনে হয় ভয় আর আমাকে কাবু করতে পারবে না।

তিন নম্বর সওয়াল ! তিন নম্বর সওয়াল ! এখনও মাথায় ঘুরছে ও কথাটা। লম্বা বারান্দার ডানধারে সার সার ঘর। আশ্চর্য, সব ঘর বন্ধ। তালা দেওয়া। প্রথম দরজাটা একটু ঠেললাম। হুড়মুড় করে দরজাটা ভেঙে পড়ল ঐ ঠেলাতেই। প্রচণ্ড একটা আওয়াজ উঠল। বুকটা ধ্বক করে উঠল। তার পরেই সব ঠাণ্ডা। মরচে পড়ে পড়ে কব্জাগুলোর কি হাল হয়েছিল, তা এবার টের পেলাম। ঘরটা ফাঁকা, কোন জিনিসপত্র নেই। দেওয়ালের আস্তর খসে পড়েছে। ইট খসে গিয়ে গর্তও হয়েছে মাঝে মাঝে! এই ঘরে কোন কিছুর হদিস পাওয়া যাবে বলে মনে হল না।

বেরিয়ে এলাম সেই ঘর থেকে। এবার পাশের ঘরের দরজাটা ঠেললাম। একটু ঠেলাঠেলি করতে গিয়ে সেটাও ভেঙ্গে গেল। সব ঘরেরই একই অবস্থা। তিন চারটি ঘরের দরজা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে একটা ঘরের সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ওগুলো কি ? দেওয়ালে ওগুলো কিসের আঁচড় কাটা ? লেখা মনে হচ্ছে। ধুলোবালির ঝাপটায় লেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে বটে কিন্তু মুছে যায় নি। আমার মাথায় তখন বোধ হয় ভূত চেপেছিল। ভয় পাওয়া দূরে থাক বেশ কৌতূহল হচ্ছিল। লেখাগুলো পড়াতে মন দিলাম।

প্রথমে বুঝতে একটু কষ্ট হল। তারপর আর কোন অসুবিধা হল না। কাদের যেন বংশ পরিচয় লেখা রয়েছে সেই দেওয়ালে। চৌধুরী রুদ্র নারায়ণ, চৌধুরী প্রভাস নারায়ণ, চৌধুরী বীর নারায়ণ—একের পর এক বংশ প্রধানের নামগুলো লেখা। তার আশে পাশে লেখা, "বংশগত সম্পত্তির মালিকানা আমি আমার পুত্র রুদ্র নারায়ণকে দিলাম", অথবা..."প্রভাস নারায়ণকে দিলাম।" এই ভাবেই এগিয়ে গেছে। সর্বশেষ বংশধরের নাম সুভাষ নারায়ণ। সুভাষ নারায়ণের নামটা পড়ে চমকে উঠলাম। এ জমিদারের নাম আমি আগে শুনেছিলাম। সুভাষ নারায়ণের পিতা দেবেশ নারায়ণের পাশে লেখা—"বংশগত সম্পত্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আমি সে সব সিন্দুকে বন্ধ করে রাখতে সাহস পাচ্ছি না। জমিদারি এলাকার কোনও

এক বিশেষ স্থানে আমি সমস্ত সম্পদ লুকিয়ে রেখে গেলাম। সেই জায়গার নকশা আমি দিয়ে গেলাম আমার বড় ছেলেকে।”

তারই নিচে সুভাষ নারায়ণ লিখেছেন—“আমি আজ অবধি বুঝতে পারছি না বাবা কোথায় বা কিসের ভেতর সেই নকশা রেখে গিয়েছেন।” পাশে তারিখ দেওয়া আছে। দরজার উল্টোদিকের দেওয়ালের লেখা এখানেই শেষ।

ঘরের আর তিন দেওয়ালে লেখার চাইতে আঁকিজুঁকিই বেশি। মাঝে মাঝে কে যেন লিখেছে—“পেয়েছি—আমি নকশা পেয়েছি। সবার চোখের আড়াল থেকে ঐ নকশা আমাকে লুকিয়ে রাখতে হবে।”

দেওয়ালে ভরা অসংখ্য আজে বাজে আঁকিজুঁকি আর কিছু কিছু সাঙ্কেতিক চিহ্নও রয়েছে। ওসব কোন কিছুরই পাঠ উদ্ধার করতে পারলাম না। এসব যে শেষ জমিদার সুভাষ নারায়ণের লেখা তা অবশ্য অনুমান করা যায়।

না, আমি আর আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না, পারবও না। প্রথম দেওয়ালে যেখানে বংশ পরিচয় লেখা ছিল সেখানে চোখটা গিয়ে পড়তেই চমকে উঠলাম। লেখাগুলো যেন সব অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার বদলে ফুটে উঠেছে কিছু ছবি। এক গাদা ধড় একধারে, তাদের মুণ্ডগুলো অন্যধারে। তার নিচে লেখা—“আমার সোনার লকেট কোথায়? কেউ জানে না। কেউ আমার তিন নম্বর সওয়ালের জবাব দিতে পারে নি। তাই তাদের সবাইকে আমি কেটে ফেলেছি।”

ঐ লেখাটা পড়ে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। আর ঠিক ঐ সময়েই যেন মৃদু কর্কশ হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। শুধু তাই নয়, আমার চোখের সামনেই মুহূর্তে দেওয়ালের লেখা আর রেখাগুলো পালটে গেল ঠিক যেন সিনেমার পর্দার মত। আর তার পরেই ভেসে উঠল আরেকটা ছবি, আর কিছু লেখা। ছবিটা একটা ধড়ের, তার উপরে তার মুণ্ডটা। পাশে লেখা—“আমরাও কেটে ফেলেছি জমিদার

সুভাষ নারায়ণকে। আমরা, আমরা।”

একের পর এক ভেসে উঠতে লাগল কিছু মুণ্ডহীন ধড় আর বিচ্ছিন্ন মুণ্ডগুলো। কর্কশ হাসির শব্দ তখনও শোনা যাচ্ছে। আমার মনে আগের মত ভয় আর নেই। থাকলেও কিসের যেন একটা দুর্বার আকর্ষণ সেই ভয়কে চেপে রেখেছে।

দেওয়ালের সেই সিনেমা কতক্ষণ চলত জানি না। হঠাৎ প্রচণ্ড ভাবে চমকে উঠলাম। ওকি! ও যে আমারই নাম। আমারই নাম ফুটে উঠেছে দেওয়ালে। কারা যেন লিখেছে—ডাক্তার, ডাক্তার, বাঁচাও আমাদের। এই দেওয়ালের আস্তর তুলে ফেললেই আমাদের ধড় গুলোকে দেখতে পাবে। নর পিশাচ জমিদারটা আমাদের ধড়গুলোকে দেওয়ালে গেঁথে দিয়েছিল। ডাক্তার, দেরি করো না। ধড়গুলো টেনে বের করে নাও। মুণ্ডগুলো উপরের ঘরে পড়ে আছে! ওগুলো এনে জোড়া লাগিয়ে দাও। আমাদের মুক্তি দাও ডাক্তার, আমরা আর পারছি না।

না, আমি ভয় পাই নি। আমার বুকটা ধ্বক ধ্বক করছিল বটে, কিন্তু আমি তাতে বিচলিত হই নি। বাইরে দিনের আলো যত সামান্যই হোক, ভিতরে আসছিল। তার সঙ্গে ভেসে আসছিল কিছু টাটকা বাতাস। ওরাই বোধহয় আমাকে সতেজ রেখেছিল। সামনের জানালার ফোকরটা দিয়ে মৃত একটা জগৎ থেকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম জীবিত, প্রাণচঞ্চল একটা সবুজ পৃথিবীকে।

হঠাৎ আমার মধ্যে কে অত সাহস জুগিয়ে দিল জানি না। প্রচণ্ড শক্তিতে দেওয়ালের গায়ে পর পর কয়েকটা লাথি মারলাম। ঝুর ঝুর করে জীর্ণ শীর্ণ আস্তরগুলি ঝরে পড়ল। দেখা গেল দেওয়ালের ইটগুলোও যেন আলগা ভাবে বসান। একটু টানাটানি করতেই কয়েকটা ইট খুলে গেল। তারপর এক সঙ্গেই দু দুটো মুণ্ডহীন কঙ্কাল দেওয়ালের গা থেকে আছড়ে পড়ল মেঝের উপর। পড়েই খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেল পুরনো হাড়গুলো। আর ঠিক সেই সময়েই প্রচণ্ড কর্কশ স্বরে কারা যেন হেসে উঠল। সেই ক্ষীণ মৃদু হাসিই

বুঝি হয়ে উঠল শতগুণে প্রখর। উঃ, এই ভয়াবহ হাসি যেন শরীরের রক্তকে জল করে দেয়!

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ঘরে থাকাই আমার পক্ষে দায় হয়ে উঠল। আমি ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কোথায় যাবো? যাবার রাস্তা যেন নেই। বাইরে বের হবার পথ কোথায়?

আমি পাগলের মত ছুটতে লাগলাম। যতই ছুটি ততই কাদের গলা যেন শুনতে পাই—ডাক্তার ডাক্তার, আমাদের বাঁচাও, আমাদের বাঁচাও। ডাক্তার, যেও না.......

(চার)

আমি যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। নির্ঘাৎ পাগল। সারা বাড়ি শুধু ছুটে বেড়িয়েছি। একতলা, দোতলা, তিনতলা। বোঁ বোঁ করে শুধু ছুটেছি আর ছুটেছি। বেরোবার রাস্তা শুধু খুঁজেছি, অথচ সেটাই ভুলে গিয়েছিলাম। । লক্ষ্যহীন ভাবেই শুধু ছুটেছি। আবার পেছনে কত কণ্ঠের হাসি আর ব্যাকুল জিজ্ঞাসা যে ছুটেছিল তার ঠিক নেই। অবশেষে ....

অবশেষে কিসে যেন পা আটকে গেল। আমি দড়াম করে উল্টে পড়ে গেলাম। না, জ্ঞান হারায় নি। প্রচণ্ড লেগেছিল। তারই ফলে ঝিম মেরে গিয়েছিলাম। হাড়গোড় ভেঙ্গেছিল কিনা সে খেয়াল তখন ছিল না। তবে আঘাত লেগে রক্ত ঝরে নি।

কতক্ষণ ঐ ভাবে পড়েছিলাম জানি না। তারপর কোনক্রমে দেহটাকে টেনে তুললাম। উঃ তবু চলতে পারছি না। আমি যেন টলে টলে পড়ে যাচ্ছি। একটা জন্তুর মত মনে হচ্ছিল নিজেকে। মানুষের মধ্যে থাকলেও শত বিপদেও নিজেকে মানুষ ছাড়া কিছুই মনে হয় না। কিন্তু তাছাড়া অন্য কারও সঙ্গে থাকলে নিজেকে যেন জন্তুর মত মনে হয়, বিশেষ করে যখন বাঁচার তাগিদ মনে থাকে।

চারধার কখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই। হাসি আর শোনা

যাচ্ছে না। টলতে টলতে কোনক্রমে আমি দেওয়াল ধরে দাঁড়ালাম। সঙ্গে টর্চ বা হ্যাভারস্যাক কিছুই নেই। কোথায় কখন পড়ে গেছে খেয়াল নেই। এ ঘরটা যে পুজোর ঘর, বুঝতে অসুবিধা হয় না। অনেকদিন আগে এঘরে যে পুজো হত তার চিহ্ন এখনও বর্তমান। ঐ তো পিতলের সিংহাসনটা এখনও রয়েছে। ওর ভিতর এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা মূর্তি—এখনও কিছুটা চকচক করছে। কালী-ঘাটের পটটা এখনও টাঙ্গানো রয়েছে। ধুলায় মলিন হয়েছে কিছুটা। বিরাট ভূতের রাজ্যটার মধ্যে এই খানেই একটু দেবতার বাস। কেন জানি না, একটা স্বস্তির নিশ্বাস আপনা হতে বেরিয়ে এল।

কিন্তু একি! বাইরে তাকিয়েই দেখলাম অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ভয়ঙ্কর ভাবে শিউরে উঠলাম। দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় জড়ো হয়ে সজোরে আঘাত করল। আবার যে আমাকে তাহলে সেই জীবন্ত ভূতের রাজ্যে ফিরে যেতে হবে। আবার যে আমকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে সেই কাটা মুণ্ডগুলোর কীর্তিকলাপ।

না না না। আমি তা পারব না। আমার বের হবার দরজা চাই। এখনি আমাকে বেরোতে হবে। এখুনি, এখুনি, এখুনি। আমি আবার পাগলের মত সেই পুজোর ঘর ছেড়ে বের হলাম। আমায় পালাতেই হবে। কিন্তু কোথায় পালাব? নিকষ কালো আঁধারের পর্দা সাপের মত এঁকে বেঁকে জড়িয়ে ধরেছে যে চারধার।

ছুটতে গিয়ে আবার একটা দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। আমার বুকে তখন যেন হাতুড়ি পড়ছে। না না, পালানো যাবে না। আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দেহ অসম্ভব দুর্বল।

হঠাৎ মনে হল, এখনও আমার বাঁচার একটা উপায় আছে। যদি এখানে কেউ আমাকে বাঁচাতে পারে তো পারবে মাকালীর সেই পট। তাহলে আমাকে ফিরে যেতে হবে সেই পুজোর ঘরে। না না, আমি মরতে চাই না। অতগুলো মুণ্ডর পাল্লায় পড়তে এক মুহূর্তের জন্যও চাই না আমি।

আবার ছুটলাম।

কি করে পুজোয় ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম, কি করে মা কালীর পটটা বুকে চেপে ধরে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। চারধার থেকে কিসের যেন শব্দ কানে আসছিল, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তারপর শুনতে পাচ্ছিলাম—'ডাক্তার, ডাক্তার, কোথায় গেলে ? ডাক্তার, বাঁচাও আমাদের, বাঁচাও আমাদের মালিককে। আজ রোগীকে দেখাতে নিয়ে যাব তোমায়। ডাক্তার, ডাক্তার, ডাক্তার—

সেই কণ্ঠস্বর আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছিল। চোখের সামনে রাশি রাশি সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

কতক্ষণ পর জ্ঞান ফিরেছিল জানি না। দেহে সাড়া জাগতেই কানে গেল নানা সুরের কলতান। আশ্চর্য ! বাড়িটা কি জীবন্ত হয়ে উঠল নাকি ? আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য ! চারধারে এত আলো এল কি করে ? আমার ঘরের এধারটা ছাড়া সমস্ত বাড়িটাই যেন হ্যাজাকের আলোয় ভরে গেছে। আলোর তীব্রতা এধারের অন্ধকারের মধ্যেও ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

মেঝের উপর আমি উঠে বসেছিলাম। এবার দাঁড়ালাম। দাঁড়াতেই চোখে পড়ল এ ঘরের ঠিক উল্টোদিকের বাড়ির অংশটা বেমালুম ভোল পালটে ফেলেছে। আলোয় আলোয় ঝলমল করছে চারধার। বারান্দার গায়ে সার সার ঘরে লাল পর্দা ঝুলছে। সিঁড়ির আগা গোড়া কার্পেটে মোড়া। উপরে সিঁড়ির পাশ থেকে উঠে গেছে রজনীগন্ধার ডাল বসানো ফুলদানির সারি। চারধারে একটা বিপুলতর আভিজাত্যের ছাপ। এত কিছুর মধ্যে প্রাণের সাড়া কিন্তু কোথায়ও নেই।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভয়ঙ্কর অবাক হয়ে গেলাম। চোখে দেখেও যে এসব বিশ্বাস করা যায় না। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের কথা শুধু আরব্য উপন্যাসেই পড়েছি। কিন্তু চোখের সামনে যে তেমন ঘটনাই ভাসছে—তাকে অবিশ্বাস করি কি ভাবে ?

হঠাৎ মনে পড়ল অশরীরীরা মায়া জানে। মায়া বলেই তারা মানুষকে বশ করে। এটাও সেই রকম কোন মায়া হবে নিশ্চয়। কথাটা চিন্তা করতেই গাটা হিম হয়ে গেল আমার। হঠাৎ একটা অবসাদ আমার উপর চেপে বসল।

মাকালীর পটটা বুকের উপর এক হাতে চেপে ধরে আর এক হাতে দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলাম। যদি তাতে কোনরকমে রক্ষা পাওয়া যায়। তারপর এক পা এক পা করে ঘরের আরও ভিতরে সরে এলাম। মাথার উপর একটা জানালা খোলা রয়েছে। বাইরের দিকে অন্ধকার পৃথিবীর উপর মায়াময় একটা চাঁদের আলোর স্নিগ্ধ রূপ দেখা যায়। আকাশের এককোণে মিটমিট করে জ্বলছে শুকতারা।

রাত তখন কত হবে জানি না। মধ্যরাত্রির কাছাকাছি হবে বোধ হয়। চারধার অসহ্য নিঝুম। দূর ঝোপ থেকে ডাকা ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁঝিঁ ডাক স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

আমি হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। কালীর পটটা বুকে আঁকড়ে ধরে আমি স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম মেঝের উপর।

—কোথায়, কোথায়? আমার লকেটটা কোথায়?

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা চীৎকারে চমকে উঠলাম। আমি যেন কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি। চারধারে রীতিমত মানুষের গলা আর পায়ের শব্দ তখন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

—আমার লকেটটা দাও। কে চুরি করেছ তোমরা—কে চুরি করেছ? আমায় ঘুম পাড়িয়ে কে তোমরা চুরি করেছ আমার লকেট? হত্যা করব আমি, সবাইকে হত্যা করব যদি লকেট না পাই। কোথায় আছে সেটা? কোথায়?

উপরে জিনিসপত্র ওলটানো আর ছুড়ে ফেলার শব্দ পাচ্ছি। কে যেন সব কিছু সরিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে তার হারানো লকেট।

—দাদা, করছো কি? দাদা—

—না না সতীশ, তুই কিছু জানিস না, তাই বলছিস। আমার বাড়িতে তুই আর ভৃত্যরা ছাড়া কেউ নেই। তুই নিতে পারিস না

লকেটটা, কারণ তুই আমার ভাই। ওরাই—ওরাই কেউ লোভে পড়ে লকেটটা নিয়েছে।

—একটা সামান্য লকেটের জন্য তুমি যে পাগলের মত কাজ আরম্ভ করেছ দাদা—

—ওটা সামান্য লকেট নয় সতীশ, ওটা সামান্য নয়। তোকেও এতদিন বলতে সাহস পাই নি। আমাদের পরিবারের সমস্ত ধনসম্পত্তির নক্‌শা ওরই ওপর বাবা এঁকে রেখে গিয়েছিলেন। অনেকদিন এটা রহস্যই ছিল আমার কাছে। যেদিন রহস্যটা প্রথম ধরা পড়ল সেদিন থেকেই ওটা আমি বুকের মধ্যে করে রেখেছিলাম। কিন্তু সেখান থেকেই কেউ ওটা সরিয়েছে। আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে কেউ ঐ লকেট সরিয়েছে।

সুভাষ নারায়ণ কথা বলতে বলতেই তখন এসে পৌঁছে গেছেন ভৃত্য মহলে। ভৃত্যদের হুকুম দিলেন সেই মুহূর্তেই তারা যেন তিন-তলার জলসাঘরে জমা হয়।

সব শুনতে পাচ্ছি আমি, সব। কি রকম যেন আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু শুনতে একটু কষ্ট হচ্ছিল না।

—দাদা, আমি একবার বাইরেটা দেখে আসি।

বুঝলাম সতীশ নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন। তাঁর ঘোড়ার শব্দও একটু পরে পাওয়া গেল। সুভাষ নারায়ণের তখন সেদিকে হুঁশ নেই। তিনতলার জলসাঘর থেকে তাঁর গলা ভেসে আসছিল।—আমার ভৃত্যদের কাউকে আমি ছাড়বো না। তিন তিনটে সওয়ালের জবাব তোমাদের দিতে হবে। তিনটে সওয়ালের জবাব।

ভৃত্যদের দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। সুভাষ নারায়ণের কণ্ঠ আবার গর্জন করে উঠল—তোমাদের যেমন আমি ভালবাসি, তোমাদের গুণের জন্য যেমন মন ভরিয়ে পুরস্কার দিই, তেমনি তোমাদের দোষের জন্য দেব চরম শাস্তি।

আজ থেকে বহু বহুবছর আগে এক অভিশপ্ত নিশিথ রাতে জমিদার সুভাষ নারায়ণের উগ্রমূর্তি দেখে সেদিন ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে উঠেছিল

সুভাষ নারায়ণের হাতে খোলা তলোয়ার···

দশবারোজন ভৃত্য। সুভাষ নারায়ণের হাতে খোলা তলোয়ার, সারা শরীর রাগে কাঁপছে, চোখগুলো ভাঁটার মত লাল। রাগলে তাঁর জ্ঞান থাকত না। এক একজন ভৃত্যকে তিনি ডেকে একটি একটি করে তিনটি সওয়াল করলেন সেদিন রাত্রে।

সুভাষ নারায়ণ বললেন—"আমার প্রথম সওয়ালের জবাব দাও। বল, কে আমার অজান্তে আমার খাবারে ঘুমের ওষুধ মিশিয়েছিলে?

—না, আমি মিশাই নি হুজুর।

—সত্যি করে বল, মিথ্যা কথা বললে প্রাণ যাবে।

—সত্যি করে বলছি, আমি জানি না, আমি মিশাই নি।

এবার দ্বিতীয় সওলাল করলেন সুভাষ নারায়ণ। বললেন—আমার বাবার দেওয়া নক্‌শার কথা তুমি জানতে?

ভৃত্য কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিল—না হুজুর।

—কখনও শোন নি সে কথা?

—না।

সুভাষ নারায়ণের কণ্ঠস্বর আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। তৃতীয় সওয়ালের কথা উচ্চারণ করলেন—তবে আমার লকেট কোথায় গেল? বল কোথায় গেল?

কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল সেই ভৃত্যের। সে রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিল—জানি না।

—নিশ্চয়ই জান কে নিয়েছে!

—না।

ভৃত্যরা কেউ এই তৃতীয় সওয়ালের জবাব দিতে পারে নি। তারা সত্যই এই সবের হদিস জানত না। কিন্তু সুভাষ নারায়ণের মাথায় সেদিন খুনের নেশা চেপে গিয়েছিল। তৃতীয় সওয়াল শেষ করে মাত্র এক মিনিট অপেক্ষা করছিলেন সুভাষ নারায়ণ। ভৃত্যের মুখের উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সেই সময়টুকু। যে মুহূর্তে বুঝলেন ভৃত্য এই সবের উত্তর দিতে পারল না, সেই মুহূর্তেই তাঁর উদ্যত তলোয়ারের ঘায়ে ভৃত্যের মাথা লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর। ধড়টা ধড়ফড় করতে

করতে কিছুক্ষণ পর স্তব্ধ হয়ে গেল।

সুভাষ নারায়ণ উত্তেজিত। কিন্তু স্থির অচঞ্চল।

এরপর এল আর একজন ভৃত্য।

তাকেও করা হল একই প্রশ্ন—তিনটি সওয়াল।

সেও কোন জবাব দিতে পারল না। শুধু কেঁপে কেঁপে জোড় হাতে মার্জনা ভিক্ষা করল।

কিন্তু মার্জনা করলেন না সুভাষ নারায়ণ।

শাণিত তরবারির আঘাতে সেই ভৃত্যের মাথাও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ধড়ফড় করে স্তব্ধ হয়ে গেল মুণ্ডহীন শরীরটা।

একটা দুটো নয়। পর পর দশ বারোটি মুণ্ড এমনি ভাবে লুটিয়ে পড়ল। রক্তের স্রোত বয়ে গেল সে রাতে সেই জলসাঘরের মেঝের উপর। যে ঘরের অঙ্গন একদিন নর্তকীর নুপুর বাঁধা পায়ের কোমল আঘাতে মুখরিত হয়ে উঠত, আজ সেই ঘরে বিরাজ করতে লাগল মৃত্যুর বিভীষিকা।

আমার চোখের সামনে যেন চলন্ত ছায়াছবির বিভীষিকাময় দৃশ্যগুলি একের পর এক ভেসে উঠতে লাগল। কী পৈশাচিক, কী মর্মান্তিক!

আমার শরীর অবশ হয়ে আসছিল। কিন্তু কিছু শুনতে, কিছু দেখতে বা কিছু বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না।

আমি কি জাতিস্মর হয়ে গেলাম? আমার কি অন্তর্দৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টি লাভ হল?

আশ্চর্য, অত হত্যা করেও সুভাষ নারায়ণ একটুও বিচলিত হন নি। দিব্যি তার পরের দিন গোপনে রাজমিস্ত্রি ডাকিয়ে এনে মুণ্ডগুলো মেঝের ভিতর পুঁতে দিয়েছিলেন আর ধড়গুলো ঘরের দেওয়ালে গেঁথে দিয়েছিলেন। সতীশ নারায়ণ তখন ধারে কাছে নেই। কদিন পর তিনি ফিরলেন। ফিরে দাদার মুখেই সব শুনলেন। লকেট পান নি বলে সুভাষ নারায়ণের রাগ তখনও পড়ে নি। সতীশ সব কথা শুনেই হঠাৎ মূর্ছা গেলেন। সুস্থ হওয়ার পর সুভাষ নারায়ণের নামে

একটা চিঠি লিখে রেখে তিনি চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।

এরপর আর দাদার সামনে আসেন নি সতীশ নারায়ণ। সেই রাত্রেই তিনি আত্মহত্যা করছিলেন।

চিঠি পড়ে সুভাষ নারায়ণ জানতে পেরেছিলেন সেই লকেট ভৃত্যদের কেউ নেয় নি। নিয়েছিল তাঁর ছোট ভাই সতীশ যাকে তিনি সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন।

সুভাষ নারায়ণ একথা জানার পরই হঠাৎ যেন পাগল হয়ে গেলেন। এতগুলো নিরপরাধ লোককে শুধু শুধু হত্যা করার গভীর অনুতাপ তাঁকে পাগল করে দিল। তার কিছুদিন পর লোকেরা সুভাষ নারায়ণের মৃতদেহ আবিষ্কার করে। কারা যেন তাঁকে হত্যা করে গিয়েছে। ধড় থেকে মুণ্ডটা তাঁর আলাদা করা।

বীভৎস নাটক কখন শেষ হয়েছিল জানি না। কখন চারধারের আলো সব নিভে গিয়ে আমার ঘরটা অন্ধকারে ভরে গিয়েছিল তাও জানি না। হঠাৎ শুনতে পেলাম কারা যেন চিৎকার করে আমাকে ডাকছে আর খুঁজে বেড়াচ্ছে। শোরগোলটা ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এই ঘরের কাছেই এসে থেমে গেল। স্পষ্ট শুনতে পেলাম বহুকণ্ঠের কথা —পেয়েছি, পেয়েছি!

নানাদিক থেকে নানা কথা ভেসে আসছে।

—ডাক্তার, বেরিয়ে এসো, তোমার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। ডাক্তার—

—শোন ডাক্তার! কিছু না পারো তৃতীয় সওয়ালের জবাবটা না হয় দিয়ে যাও।

—ডাক্তার! ডাক্তার!! ডাক্তার!!!

মাঝে মাঝে দড়াম দড়াম করে দরজার উপর কাদের যেন ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম। এখনি যেন ভেঙ্গে ফেলবে তারা ঐ পুরানো জীর্ণ দরজা।

শাসানির শব্দ কানে গেল। কারা যেন বলছে—ডাক্তার, বেরিয়ে এসো। কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না যদি আমরা না বাঁচাই।

নিজে যদি বাঁচতে চাও ডাক্তার তাহলে আমাদেরও বাঁচাও। তৃতীয় সওয়ালের জবাবটা না হয় বলে দিয়ে যাও। ডাক্তার—

না, আমার আর জ্ঞান ছিল না এরপর। কালীর পটটা বুকে চেপে ধরে অবশ হয়ে গিয়েছিলাম।

(পাঁচ)

চোখ যখন মেললাম তখন কোথায় আমি এটা বুঝতেই অনেক সময় লেগে গেল। চারদিকে দিনের আলো।

ব্যাপারটা যেন কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

আমি আমার গাঁয়ের ডিসপেনসারির ঘরে আমার খাটের উপর শুয়ে আছি। আমার খাটের চারপাশে পরিচিত অপরিচিত অসংখ্য লোক।

আমি চোখ খুলতেই অনেক রকম ফিসফাস কথা শুনতে পেলাম। রসুলপুর গাঁয়ের পঞ্চায়েত সমিতির এক প্রধান প্রশ্ন করলেন—ডাক্তার-বাবু, এখন কেমন আছেন ?

প্রথমে কোন জবাব দিতে পারলাম না। শুধু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম—ভাল।

আমার নিজস্ব ভৃত্য রঘুকেও দেখলাম পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েই সে ভিতরে চলে গেল তারপর একটু বাদেই এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে এসে হাজির। আমার দেহের ক্লান্তি তখনও যায় নি। শরীরটাকে বিছানার থেকে উঠাতে পারছি না। মাথার মধ্যে নানা প্রশ্ন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। আমি যাদের দেখছি তারা সত্যি রক্ত মাংসের মানুষ তো ?

আমি এখানে আবার এলাম কি করে ? সেই কাটা মুণ্ডর রাজ্যই বা গেল কোথায়। কোথায় সেই জমিদার বাড়ি ?

—ডাক্তারবাবু দুধটা খান।

রঘুর কথায় চমকে গিয়ে একটু উঠে বসবার চেষ্টা করলাম।

আমার কাছের লোকেরাই আমাকে উঠে বসতে সাহায্য করল। দুধটা খেয়ে আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম সকলের মুখের দিকে!

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে সেই পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান বললেন—ডাক্তারবাবু, আপনাকে যে ফিরে পেয়েছি সে আমাদের অনেক ভাগ্য। সময় মত আপনার কাজের লোকটি যদি আমাদের খবর না দিতে যে বাবু দু'দিন ধরে ফিরছে না তাহলে আজ কেন কোনদিনই আর আপনাকে ফিরে পেতাম না।

আমি তখনও কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলাম সেই অঞ্চল প্রধানের দিকে। কোন কথা জিজ্ঞেস করতে আর ভরসা হচ্ছে না।

অঞ্চল-প্রধান বলেই চললেন—আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম। নতুন লোক এলেই তেনারা প্রায়ই ধরে নিয়ে যান। তবে ডাক্তারের উপর অত্যাচার এই প্রথম। ইস্ আপনার শরীরের কি দশা হয়েছে। ব্যাপার কি হয়েছিল বলুন তো ডাক্তারবাবু।

অনেকে তখন বাধা দিয়ে বলল—না না, ডাক্তারবাবু এখন ভয়ানক দুর্বল, এখন কিছু তাঁকে জিজ্ঞেস করা দরকার নেই।

কিন্তু আমার মনে তখন সাহস জেগে উঠেছে। কি এক মন্ত্রবলে যেন আমার দুর্বলতা কেটে গিয়েছে। আমি সংক্ষেপে সব ঘটনাই তাদের কাছে বললাম।

তখন পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান বললেন—আপনি এমন ভাবে কোনদিন তো ফিরতে দেরি করেন না, তাই মনে নানা সন্দেহ জাগতে লাগল। আর আপনার বাড়ির কাজের লোক রঘুই বলল—একটা অদ্ভুত চেহারার লোক নাকি আপনাকে ডেকে নিয়ে গেছে। সে নাকি একবার দেখেছিল তাকে। কিন্তু অত খেয়াল করে নি। আমরা নানা ভাবে খবর নিয়ে লোকজন যোগাড় করে সেই অভিশপ্ত জমিদারের পড়ো বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। তারপর তন্ন তন্ন করে খুঁজে ভেতর মহল থেকে বার করলাম আপনাকে। তখন তো আপনার কোন হুঁশ নেই, প্রায় অর্ধমৃত অবস্থা। যা হোক, ঐ জায়গা থেকে আপনাকে যে

জীবিত অবস্থায় নিয়ে আসতে পেরেছি এবং আপনাকে সুস্থ করে তুলতে পেরেছি সেটা আমাদের সৌভাগ্য।

আমি জবাব দিলাম—এটা আমারও সৌভাগ্য। এ জন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

আমার এই ঘটনার কথা কেউ বিশ্বাস করল কেউ বিশ্বাস করল না। কিন্তু সবাই জানে আমি মিথ্যে কথা বলার লোক নই। তাই ব্যাপারটার গুরুত্ব অনেকেই উপলব্ধি করল।

পঞ্চায়েত-প্রধান বললেন—কাঞ্চনপুরের জমিদার বাড়ির অনেক কিছু কাহিনী আমাদের কানে মাঝে মাঝে আসে। সেই বাড়িতে ঢুকলে কেউ নাকি আর ফিরে আসে না। একথায় আমরা কোন গুরুত্ব দিই না। কিন্তু আপনার মুখে যে ঘটনা শুনলাম আর আমরাও যা যা দেখলাম তাতে ব্যাপারটা তো খুবই ভয়ানক মনে হচ্ছে।

আমি বললাম—ডাক্তার হয়ে এসব কাহিনী আমার মোটেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু আমার নিজের জীবনেই এই ঘটনা ঘটল তা অবিশ্বাস করি কি করে? তবু মনে হয় যেন ওসব স্বপ্ন দেখছি।

অঞ্চল-প্রধান বললেন—বাবু, আপনি তো সরকারের লোক। সরকারের কাছে এই নিয়ে লিখুন না, হয়তো একটা কিছু বিহিত হতে পারে।

কথাটা আমার কাছেও ভাল লাগল। ভাবলাম, দেখি না সরকারের কাছে লেখালেখি করে যদি কোন কিছু ব্যবস্থা হয়।

এই ঘটানায় আমার মনের উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত এসেছিল। এবার মনের ভেতর একটা জেদ জেগে উঠল।

আমি সরকার বাহাদুরের কাছে প্রথম একটা আর্জি পেশ করলাম —রসুলপুর থেকে আমি বদলী চাই। আর শুধু রসুলপুরই নয়, এই জেলা থেকেই বদলী চাই অন্য কোন জেলায়। সেই সঙ্গে আর আর একটা আর্জিও পেশ করলাম সরকারের কাছে। কাঞ্চনপুরের জমিদার বাড়িটার জন্য বহুলোকের প্রাণহানি ঘটছে বলে এই অঞ্চলের লোকদের

বিশ্বাস। সরকার যেন বুলডোজার দিয়ে ঐ বাড়িটা ভেঙ্গে ফেলেন। তাহলে ঐ অঞ্চলের বহুদিনের একটি সঙ্কট ও সমস্যার সমাধান হবে।

আমি যে সরকারের কাছে বদলী হবার জন্য দরখাস্ত..করেছি তা কি করে যেন গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেল। তারা দলে দলে এসে আমাকে অনুরোধ করতে লাগল—ডাক্তারবাবু আপনি নাকি বদলী হবার জন্য দরখাস্ত করেছেন? যাবেন না ডাক্তারবাবু, আমাদের ছেড়ে যাবেন না।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এতদিন যেখানে আমি সম্পূর্ণ অনাদৃত ছিলাম, সেখানে রাতারাতি এত জনপ্রিয় হয়ে গেলাম কি করে!

পঞ্চায়েত-প্রধানও একদিন এসে বললেন—ডাক্তারবাবু, আপনি কি ভয় পেয়ে চলে যেতে চাইছেন এখান থেকে?

আমি বললাম—না ভয় নয়। এখানে শরীরটা আমার মোটেই ভাল যাচ্ছে না, তাই জলবায়ুটা একটু পরিবর্তন করতে চাই।

পঞ্চায়েত প্রধান বললেন—না ডাক্তারবাবু, যাবেন না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আমার এই দরখাস্তের কথা আপনারা জানলেন কেমন করে?

পঞ্চায়েত-প্রধান জবাব দিলেন—কোন কথা কি আর চাপা থাকে বাবু? কুকথা তো বাতাসের আগে যায়।

আমি বললাম—কিন্তু আমি যে সরকারের কাছে দরখাস্ত করেছি, কাঞ্চনপুরের রাজবাড়িটা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য, সেটা তো আপনারা জানতে পারলেন না।

পঞ্চায়েত প্রধান উৎফুল্ল হয়ে বললেন—তাই নাকি? সেটা তো ভাল কথা। তাই ওটা এত তাড়াতাড়ি ছড়ায় নি। খুব ভাল করেছেন ডাক্তারবাবু, খুব ভাল কাজ করেছেন। যদি সেটা সরকার মঞ্জুর করেন তা হলে একটা কাজের কাজ হবে। তা হলে কিন্তু কোনদিন আপনাকে এখান থেকে যেতে দেব না।

আমি বললাম—দেখা যাক্ কি হয়।

আশ্চর্য! দেখলাম, দ্বিতীয় আর্জিটার ব্যাপারে আগে তদন্ত শুরু হল। তদন্ত হওয়ার পর আর্জিটা মঞ্জুরও হয়ে গেল। আমাকে সরকার

পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হল, ঐ বাড়ি ভাঙ্গার সময় আমি যেন কিছু লোকজন নিয়ে উপস্থিত থাকি।

আমি ব্যাপারটা পঞ্চায়েত প্রধানকে জানলাম। উনি খুব উৎসাহ দেখালেন। বললেন—বেশ আমরা যাব। গ্রাম থেকে আর কে কে যাবে এবং কারা পালা করে সেখানে থাকবে তার তালিকা তৈরি করতে লেগে গেলেন।

কিন্তু আশ্চর্য! দেখা গেল, গ্রামের অনেক লোকই ঐ ভয়ঙ্কর ভূতের আড্ডায় হানা দেবার ব্যাপারে ভয় পায়। তারা সামনে থাকতে চায় না। হয়তো মনে করে ভূতের আক্রোশ যদি তাদের উপর পড়ে?

যাহোক, সামান্য কয়েকজন লোক পাওয়া গেল। আমি এবং অঞ্চল প্রধান ঐ কয়েকজন লোককে নিয়েই নির্দিষ্ট দিনে হাজির হলাম কাঞ্চনপুর গ্রামে।

বাড়ি ভাঙ্গা শুরু হল। অনেকগুলো কঙ্কালও পাওয়া গেল বাড়ি ভাঙ্গার সময়ে। তারা অবশ্য কোন উপদ্রব করল না।

তবে ঘরের ভেতরের জিনিসপত্র উদ্ধার করার সময় কয়েকজন মজুরের মুখে শোনা গেল, তারা অনেক কিছু অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছে। তারা অকারণে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে—কেউ যেন তাদের ধাক্কা দিচ্ছে —চাপা কণ্ঠের আওয়াজ শুনেছে অথচ লোক দেখতে পায় নি—এইসব অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন তারা হয়েছে।

প্রথম দিনের কাজ হবার পর দ্বিতীয় দিন থেকে কিন্তু বহুলোক সেই বাড়ির সামনে হাজির হয়েছিল। দূর দূরান্তের গ্রাম থেকেও এসেছিল অনেক মানুষ। ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষিত এবং প্রবীণ লোকও ছিলেন। তাঁরা সকলে মিলে সরকারের লোকেদের কাছে বলেছিলেন—এত বড় একটা বাড়ি অবহেলায় পড়ে ছিল, কেউ লক্ষ্য করে নি। এখানে যদি একটা সরকারী হাসপাতাল ও ইস্কুল হয় তা হলে এই এলাকার অনেকদিনের অভাব দূর হবে।

আমিও তাতে সায় দিয়েছিলাম।

কিন্তু কিছুদিন পর আমার বদলীর দরখাস্তটাও মঞ্জুর হয়ে এসেছিল, সেটা আমি গ্রামবাসীদের কাছে গোপন করেছিলাম।

আমি একদিন সকলের অজান্তেই চলে এসেছিলাম রসুলপুর গ্রাম ছেড়ে। কারণ সরকারী নির্দেশ পত্রে দেখেছিলাম আমাকে এবার একটা ভাল জায়গাতেই বদলী করা হয়েছে.

কাজেই সেই সুযোগ আমি ছাড়ি নি।

জানি না, কাজটা আমার পক্ষে ভাল হয়েছিল কি মন্দ হয়েছিল। পরে অবশ্য কাঞ্চনপুরেরও কোন খবর আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয় নি।

রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

উদ্যোগ আয়োজন তখন প্রায় শেষ। গির্জার হলটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করা হয়েছে। একটু পরেই পবিত্র দীক্ষা উৎসব শুরু হবে। অনেক দূর দূরের চার্চ থেকে রেভারেণ্ডরা এসে গিয়েছেন। সংখ্যায় তাঁরা চারজন।

ক্যাথলিক পুরোহিতরা সকলেই তৈরী।

যে তিনজন আজ ধর্মযাজক হবার জন্য দীক্ষা নেবে তারাও সবাই এসে গিয়েছে। শান্ত সৌম্য তাদের চেহারা আজ যেন আরও উজ্জ্বল, আরও সুন্দর।

সব কিছু ব্যবস্থা প্রস্তুত। ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাতটা।

এমন সময় হঠাৎ দু'জন সন্ন্যাসিনী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে সেখানে উপস্থিত হলেন।

মনে হয় তারা খুব ভয় পেয়ে গেছেন। তাঁরা বললেন—ফাদার, ফাদার! শীগগীর আসুন।

বিস্মিত হয়ে অনেকেই জিজ্ঞেস করল—কেন, কি হয়েছে?

হাঁপাতে হাঁপাতেই সন্ন্যাসিনীরা বললেন—আসুন, সবাই শীগ্গীর আসুন। ডেভিডকে মনে হয় ভূতে পেয়েছে।

ভূতে পেয়েছে? কথাটা শুনে ঘরের আহাওয়াটা যেন বদলে গেল।

তখন গল্প বলছিলেন ক্যাথলিক প্রিস্ট ফাদার ফ্রানসিস হুড। বয়স তাঁর খুব বেশি নয়। গৌরবর্ণ, সৌম মূর্তি! পরনে লম্বা সাদা আলখাল্লা। ঈশ্বরের কথা শোনাতে গিয়ে নিজের জীবনের কয়েকটি আশ্চর্য রকমের সত্য ঘটনার কথা বলছিলেন। সেখানে ছিল প্রায় ঘর ভরতি তরুণ ছাত্র সমাজ। তারা বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মাঝে মাঝে আসে। আজও এসেছে। তারা সকলেই কলেজে পড়া ছেলে। মুগ্ধ হয়ে তারা ফাদারের কথা শুনছিল। এতক্ষণ ঘরে শান্ত নীরবতা বিরাজ করছিল, এবার বিরাজ করতে লাগল যেন একটা ভৌতিক নিস্তব্ধতা।

এ যেন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

ফাদার হুড স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অন্যান্য অনেকে কেউ বিশ্বাস করল, কেউ বিশ্বাস করল না। বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায় কথাটা যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চাইল না।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই কাছাকাছি কোন ঘর থেকে চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যেতে লাগল। আর শোনা যেতে লাগল জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলার আওয়াজ। ফাদার হুডের কানেও বুঝি সেই শব্দ গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়াল কয়েকজন তরুণ ছাত্রও। ফাদার হুড সন্নাসিনীদের নির্দেশ মত ঘরের বাইরের দিকে পা বাড়ালেন। উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা ও কৌতূহল নিয়ে অনেকেই ফাদারকে অনুসরণ করল। কিছু লোক রয়ে গেল ঘরেই। তারা নানা ধরণের আলোচনা শুরু করে দিল। যে তিনজনকে সেদিন দীক্ষা দেওয়ার কথা, তারা তেমনি স্থির ভাবেই নীরবে বসে রইল।

সন্নাসীদের থাকবার ঘর গির্জা থেকে বেশি দূরে নয়। মাঝে একটি স্কুল ঘর। স্কুলটি তিনতলা। তিনতলার উপরও আর একটি তলা ছিল। আওয়াজটা আসছিল ঠিক থাকবার ঘর থেকে নয়, এই চতুর্থ তলার কোণের দিক থেকে। চারতলার কোণের দিক থেকে আলো আসছিল বলেই সবার মনে সেই ধারণা হল। সেখানে আলো জ্বলছিল বারান্দায়

ডেভিডের সম্বন্ধে এখানে একটু কথা বলে নেওয়া ভাল। তার পুরো নাম ডেভিড হ্যামিলটন। জাতিতে আংলো ইণ্ডিয়ান। স্বভাব চরিত্র অত্যন্ত খারাপ। এমন খারাপ কাজ নেই যা ও করে না। পয়সা চুরি করে মাদক দ্রব্য গ্রহণ করা ওর এক সময় একটা নেশা হয়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও কেউ তাকে ভাল করতে পারে নি। সে এত অবাধ্য আর উদ্ধত ছিল যে অনেকে তাকে এক রকম ত্যাগই করেছিল। ওরই সহপাঠী মাইকেল স্কট, আজকে যে তিনজনকে ধর্মযাজক হবার দীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল, সে ছিল তাদেরই একজন। মাইকেলও আগে ডেভিডের মতই ছিল। বরং ডেভিডের চেয়ে আরও খারাপ বলা যেতে পারে। কিন্তু মাইকেলের চরিত্র পালটে গিয়েছিল, ডেভিডের কোন উন্নতিই হয় নি।

যা হোক, ফাদারের সঙ্গে অনেকেই মন্থর গতিতে সিঁড়ি ভেঙ্গে চারতলায় উঠে এল। চারতলাটা সিস্টারদের থাকার জায়গা। সেখানে গিয়ে দেখা গেল চার পাঁচজন সিস্টার কোন ভাবে সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। আর ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে তারা সবাই।

গ্রিলের দরজার ওপাশ থেকে দেখা যাচ্ছিল ডেভিডকে। দেখে সবাই প্রায় আঁতকে উঠল। কি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে তার তখনকার চেহারা। মাথা ফেটে গিয়েছে, রক্ত ঝরছে সেখান দিয়ে। দুই কষ দিয়েও গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। তবু হাত আর পা দিয়ে ক্রমাগত ধাক্কা আর লাথি মেরে ভাঙ্গতে চেষ্টা করছে দরজাটা। তার ফলে হাত আর পা কেটে গিয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

ফাদারকে আর অন্যসব লোককে দেখে ডেভিড আরও যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল। একটা অমানুষিক কণ্ঠস্বর তার গলা দিয়ে বের হচ্ছিল। সেই রকম কণ্ঠস্বর নিয়ে চিৎকার করে অশ্রাব্য গালাগাল দিতে দিতে ডেভিড আছড়ে এসে পড়তে লাগল গ্রিলের দরজাটার উপর। ওটাকে যেন সে ভেঙ্গে ফেলবেই। গ্রিলের দরজার পেছনেই আর একটা কাঠের দরজা ছিল। ডেভিডের হাবভাব দেখে সবাই একটু

ঘাবড়ে গিয়ে সেই কাঠের দরজাটা বন্ধ করে দিল। ফাদার তখন আদেশ করলেন সিস্টারদের নিচে চলে যাবার জন্য। তারপর কিছুক্ষণ ভূতে পাওয়া ডেভিডকে খুব মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

ডেভিডের উন্মত্ততা একটুও কমছে না।।

কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে ফাদার বললেন—এখানে বাইবেল পাঠ করা হবে। এছাড়া অন্য কিছুতে কাজ হবে না। বাইবেলটা নিচ থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর।

দু'জন নিচে ছুটে গেল বাইবেল আনবার জন্য।

নিচে তখন আরও দুজন ফাদার এসে হাজির হয়েছেন। তারাও খবর শুনে উপরে উঠে এলেন। বাইবেলও আনা হল।

শুরু হল বাইবেল পাঠ।

ফাদারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সকলে মিলে সমবেত ভাবে উদাত্ত কণ্ঠে বাইবেল পাঠ করতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে সেখানে গড়ে উঠল এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ।

ফাদার ভেবেছিলেন, এবার হয়ত ধীরে ধীরে ডেভিডের মনের ভাবের পরিবর্তন হবে। কমে আসবে তার উন্মত্ততা।

কিন্তু তা হল না। বরং তার বিপরীত ভাবই ক্রমে ক্রমে দেখা যেতে লাগল।

যতই বাইবেল পাঠ জোরাল হয়, আর সেই স্বর ডেভিডের কানে গিয়ে পৌছায় ততই যেন সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। চীৎকার আরও বেড়ে যায়।

কেউ কেউ বাইবেল পাঠ বন্ধ করে দিতে চাইল।

ফাদাররা বললেন—না, না, বাইবেল পাঠ থামিও না, পড়ে যাও—পড়ে যাও।

ডেভিড রক্ত চোখ দেখিয়ে আর হাত মুখ নাড়িয়ে বাইবেল পাঠ বন্ধ করে দেবার হুমকি দিতে লাগল। কতবার যে জানালা দিয়ে থুথু ছেটাল তার ইয়ত্তা নেই। রাগে ফুলতে ফুলতে মোটা আর ঘন

জালে ঘেরা জানালা দিয়ে বেশ কয়েকবার বালতি বালতি জল ছুঁড়তে লাগল। যদি জানালায় ওভাবে জাল না লাগান থাকত, তা হলে ঐ রকম ভাবে জল ছুঁড়ে নিচে ফেলার জন্য অনেকেই হয়ত আহত হয়ে পড়ত।

ওধার থেকে যখন সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল তখন এধার থেকে চারজন ফাদার ছুঁড়তে লাগলেন ডেভিডকে লক্ষ্য করে চার্চের মন্ত্রপূত জল। অন্যান্যরা তখন সমবেত ভাবে আরও জোরে বাইবেল পড়ে যেতে লাগল।

কিন্তু এত কিছুও ডেভিডকে স্পর্শ করতে পারল না। এত বেশি দূরত্বের মধ্যে সে ছিল, আর সময় সময় এমন লাফ মেরে সরে সরে যাচ্ছিল যে ফাদারদের জলের ছিঁটা তার গায়ে মোটেই লাগছিল না। এত উচ্চ কণ্ঠে পড়া বাইবেলের শ্লোকের কথাগুলিও যেন ডেভিডের রোষতপ্ত গম্ভীর গর্জনের মধ্যে ম্লান হয়ে যাচ্ছিল।

এ ভাবেই আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। ফাদাররা যেন কি পরামর্শ করলেন। তারপর একজন বয়োবৃদ্ধ ফাদার জানালার এপাশ থেকে উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—ডেভিড, তুমি এমন করছ কেন? বল তুমি কি চাও?

একটা কুৎসিত ভাষায় ডেভিড জবাব দিল—মাইকেল স্কটের হৃৎপিণ্ডটা চাই।

সবাই আঁতকে উঠল।

কি অদ্ভুত আর কি বীভৎস কথা!

ফাদার জিজ্ঞেস করলেন—কেন তুমি স্কটের হৃৎপিণ্ড চাও? সে কি করেছে তোমার?

ডেভিড বলল—মাইকেল স্কটকে আমি কিছুতেই প্রিস্ট হতে দেব না। কিছুতেই আমি ওর জীবন কথা আর কাউকে শুনতে দেব না। তোমরা আমাকে কতক্ষণ এভাবে আটকে রাখবে? যদি তোমরা উৎসব আরম্ভ কর তা হলে আমি সব ভেঙ্গে চুরে এখান থেকে বেরিয়ে আসব।

ফাদার জিজ্ঞেস করলেন—কেন তুমি মাইকেল স্কটকে প্রিস্ট হতে দেবে না? কেন তুমি তার জীবন কথা কাউকে শুনতে দেবে না? —বল, কেন?

আবার কিছুটা গালাগাল দিয়ে কর্কশ ভাষায় ডেভিড বলল—আমার ইচ্ছে। মাইকেল আমার বন্ধু। ওর আত্মার উপর অধিকার ভগবানের চেয়ে শয়তানের বেশি আছে। আমি তাই আমার প্রাপ্য চাই।

এদিকে তখন সিঁড়ি ভরতি কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে গেছে। সবাই শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখছে—বেশি উপরে উঠবার সাহস কারোর নেই।

ফাদাররা আবার নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলেন। অন্যান্য সবাই চারতলার বারান্দার দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল যাতে ডেভিড ওখান থেকে লাফিয়ে না পড়ে। ডেভিডের অবশ্য তখন ওদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। একটা ভীষণ অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে সে লাফাচ্ছিল। আর একটা হাতও ঘুরাচ্ছিল অস্বাভাবিক ভাবে। ডান হাতটা থামিয়ে আবার ঘোরাচ্ছিল বাঁ হাতটা। এত প্রচণ্ড গতিতে ঘোরাচ্ছিল যে যারা দূর থেকে দেখছিল তাদেরও ভীষণ ভয় করছিল। কি অঘটন ঘটে যাবে কে জানে!

ফাদাররা পরামর্শ শেষ করে বললেন—ডেভিড, বল তোমার মধ্যে কে ভর করেছে? আমরা তার আত্মার মুক্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব।

একটা পৈশাচিক হাসিতে ফেটে পড়ল ডেভিড। এদিকে আর এগিয়ে এল না। দূর থেকেই কিছুক্ষণ থুথু ছেটাল। হাত ঘোরানো তখনও তার সমানে চলেছে। গতিবেগ দেখে মনে হল একটুও যেন তা কমে নি

ওর হাসি দেখে সবার ভয় হচ্ছিল। কি অদ্ভুত নিষ্ঠুর সেই হাসি। তার গায়ের সমস্ত রক্ত যেন মুখে চোখে জমা হচ্ছিল। হাসির ফাঁকে ফাঁকে রক্ত মাখা দাঁতগুলিও মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল। রক্ত ঝরে

পড়ছিল মুখ দিয়ে। কোন কথাই কিন্তু তখন তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল না।

একজন ফাদার জিজ্ঞেস করলেন—ডেভিড, তুমি আমাদের প্রশ্নের জবাব দাও। বল কে তোমার উপর ভর করেছে? বিশ্বাস করো, আমরা তার আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করব।

ডেভিড হাসি থামিয়ে এবার বিশ্রী ভাষায় কিছুক্ষণ গালাগাল দিল। তারপর আগের মতই ভারী অথচ সম্পূর্ণ অন্যরকম গলায় বলল—আমি শয়তানের দাস, তোমর কেউ আমার কিছুই করতে পারবে না। তোমরা উৎসব আরম্ভ করলেই আমি ছুটে গিয়ে মাইকেলের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে আনব। আমি শয়তানের দাস, আমি জোসেফ মূর। হাঃ হাঃ হাঃ!

এই কথা বলে ডেভিড হ্যামিলটন আবার পৈশাচিক হাসি হাসতে লাগল।

সবাই চমকে উঠল ডেভিডের মুখে জোসেফ মূরের নাম শুনে। জোসেফ মূর ছিল এই স্কুলেরই বাগানের মালি। অসম্ভব নেশাখোর, মদ্যপ মাতাল বলে শেষের দিকে স্কুলের কাজ থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবু ফাদারের হাতে পায়ে ধরে সে থেকে গিয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই একদিন রাত্রে তাকে মৃত অবস্থায় বাগানের মধ্যে পাওয়া যায়। পোস্টমর্টেম করার পর ডাক্তার রায় দিয়েছিলেন আত্মহত্যা। সেটা অনেকদিন আগেকার ঘটনা বলে তার কথা অনেকেই ভুলে গিয়েছিল। আবার হঠাৎ ডেভিডের মুখে সেই নাম শুনে সকলের বুকই ছ্যাঁৎ করে উঠল

ফাদারদের মধ্যে রেভারেণ্ড এণ্ডারসন ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিচক্ষণ। তিনি বললেন—আমার মনে হয় এতে কাজ হবে না। যখন জানা গিয়েছে জোসেফ মূর ডেভিডের উপর ভর করেছে, তখন জোসেফের কবরে গিয়ে একবার প্রার্থনা করলে হয় না? হয়ত তার ফলে তার অতৃপ্ত আত্মা কিছুটা শান্ত হবে, ডেভিডকে সে ত্যাগ করবে।

কবরখানার নাম শুনে অনেকেই ভয় পেয়ে গেল। কাঁটা দিয়ে

উঠল অনেকের মনে। একজন ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল—এই রাতে কবরখানায় যাবেন ?

ফাদার এণ্ডারসন বললেন—এছাড়া উপায় কি ? যেতেই হবে। আপনারা সবাই যাবেন তো ? ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমরাও যাবে তো ?

ছাত্ররা সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। কেউ মন খুলে কোন জবাব দিতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত স্থির হল, ফাদারদের মধ্যে দু'জন যাবেন আর দু'জন থাকবেন এখানে। ছাত্রদের মধ্যে যারা সাহসী তারা কয়েক জন প্রার্থনা করতে যাবে আর বাকীরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইবেল পড়বে।

এই সব কথাবার্তা যখন চলছিল তখন দেখা গেল ডেভিড যেন কান খাড়া করে সব শুনছে। সব কথা শোনা হয়ে গেলে পর ডেভিডের সে কি আক্রোশ ! দরজার উপর বিপুল বিক্রমে এক একবার এসে পড়ে আবার নিমেষেই সরে যায়। ফাদার যখন চার্চের মন্ত্রপূত জল ছিটায় তখন তা তার গায়ের কিছুতেই লাগে না।

এর মধ্যেই রেভারেণ্ড এণ্ডারসন, রেভারেণ্ড হিউস ও তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন ছাত্র কবরখানার দিকে পা বাড়াল। বাকীরা সব রইল সেখানেই। যাবার সময় ফাদার এণ্ডারসন সিঁড়ির সমস্ত ভিড় সরিয়ে দিয়ে গেলেন। স্কুলের সব ক'জন দারোয়ানকে মশাল জ্বেলে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। যদি ডেভিড দরজা ভেঙ্গে বেরিয়ে সেই উৎসব ঘরের দিকে জোর করে ছুটে যেতে চায় তা হলে এই মশাল হবে রক্ষা কবচ।

যাঁরা কবরের দিকে যাবার জন্য যাত্রা করলেন, তাঁরা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলেন সন্তর্পণে। তরুণ ছাত্রদের মধ্যে যারা অনেকেই ভূতকে বিশ্বাস করে না, তাদের অবস্থা কিন্তু বেশ শোচনীয় হয়ে পড়ল। ঢিপ ঢিপ করতে লাগল তাদের বুক।

শুধু ফাদার দু'জনই নির্ভয়ে হেঁটে যেতে লাগলেন। তাঁদের নির্দেশেই

সঙ্গে কোন আলো নেওয়া হল না। এ যেন নীরব শ্মশানযাত্রা। রেভারেণ্ড এণ্ডারসনের কবরখানার পথ ভালভাবেই চেনা ছিল। তাঁর পক্ষে জোসেফ মূরের কবর খুঁজে নিতে খুব কষ্ট হল না। যদিও তখন অনেকের গা ছমছম করছিল। তবু অস্বাভাবিক কোন জিনিস কারুর চোখে পড়ল না। চারদিকের অন্ধকার মৃত্যুর নিস্তব্ধতার সঙ্গে মিশে যেন সেখানে এক গভীর নিঃসঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছিল।

জোসেফ মূরের কবরের কাছে পৌঁছে গেল সবাই। ফাদারের নির্দেশে সবাই সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাঁরই নির্দেশে সকলে নত মস্তকে চোখবুজে নীরবে প্রার্থনা করতে লাগল। রেভারেণ্ড এণ্ডারসন প্রার্থনার শুরুতেই মৃদু কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, কেউ যেন তাঁর নির্দেশ ছাড়া চোখ না খোলে। তাই শত ইচ্ছা থাকলেও কেউ চোখ খোলে নি। সেই সময়ে এক অস্বাভাবিক অনুভূতি ও রুদ্ধ আবেগ যেন সবার মনকে তোলপাড় করে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, বহুদূরে কে যেন হাসছে, হয়ত কিছু একটা এগিয়ে আসছে তাদের দিকে, তবু কারুর কিছু করবার ছিল না।

এক সময় প্রার্থনা শেষ হল। রেভারেণ্ড এণ্ডারসন মৃদু কণ্ঠে সকলকে চোখ খোলার নির্দেশ দিলেন। কবরের চারধারে ছিল অনেক ফুলের গাছ। সেখান থেকে ফুল তুলে নিয়ে জোসেফের কবরে ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হল। তারপর সবাই ধীরে ধীরে সেখান থেকে বিষণ্ণ মনে ফিরে এল।

কবর থেকে ফিরে এসে ফাদাররা দেখলেন, এদিকের পরিস্থিতি শান্ত। লোকজন আবার সিঁড়িতে ভিড় করেছে। ডেভিড পড়ে আছে অজ্ঞান হয়ে। কেউ দরজা খুলে ভিতরে ঢুকবারও সাহস করছে না।

সেখানে যে দু'জন ফাদার ছিলেন তাঁরা বললেন—এইমাত্র ডেভিড নিস্তেজ হতে হতে জ্ঞান হারিয়েছে। আমরা অপেক্ষা করছিলাম তোমাদের ফিরে আসার জন্য। চল এবার একসঙ্গে সবাই মিলে ভিতরে ঢুকি।

রেভারেণ্ড এণ্ডারসন বললেন—তাই করো। তবে মশাল একটাও নিভিও না। ডেভিডের ভেতর প্রেতাত্মাটা মূর্ছার ভান করেও পড়ে থাকতে পারে।

যা হোক, দরজা খোলা হল। মশাল হাতে তখন দারোয়ানরা দরজা আগলাচ্ছিল। ডেভিডের কাছে গিয়ে দেখা গেল, সে সত্যি অজ্ঞান হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও তার সেই জ্ঞান ফেরান সম্ভব হল না।

কয়েকজন লোককে ডেভিডের কাছে পাহারায় রেখে ফাদাররা সবাই গির্জা ঘরে ফিরে গেলেন। সেখানে দীক্ষা উৎসব শুরু করতে হবে। উৎসব অনেকক্ষণ আগেই শুরু হত—শুধু ডেভিডের জন্যই দেরি হয়ে গেল।

ওদিকে গির্জা ঘরে তখন শুরু হয়ে গেছে আর এক নাটক। অবিশ্বাস্য নাটক। যে তিনজনকে আজ ধর্মযাজক হবার জন্য দীক্ষা দেওয়া হবে তাদের ভেতর রয়েছে মাইকেল স্কট। মাইকেল স্কটকে দীক্ষা দানে বাধা দেবার জন্যই জোসেফ মূরের প্রেতাত্মা ডেভিডের উপর ভর করেছিল।

সেই মাইকেল স্কটকে নিয়েই শুরু হয়েছে গণ্ডগোল। হঠাৎ দেখা গেল মাইকেল স্কটের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। সে আবোল তাবোল বকছে পাগলের মত।

সে বলছে—না না, আমি প্রিস্ট হবো না। আমি প্রিস্ট হবার উপযুক্ত নই। আমি পাপী, আমি খুনী, আমি বিশ্বাসঘাতক।

মাইকেল স্কটের মুখে এই সব কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। একি, এসব কথা বলছে কেন স্কট?

—স্কট, তুমি কি বলছ?

অনেকেই ঘিরে ধরল স্কটকে। যে স্কট কিছুক্ষণ আগেও শান্তশিষ্ট ভাবে বসেছিল, সে এখন অশান্ত চঞ্চল। দীক্ষা নেবার আগে যে লম্বা শুভ্র পবিত্র পোশাকটি সে পরিধান করেছিল, সেই পোশাকটাকে দু'হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। আর চেঁচিয়ে বলতে লাগল—

না না, আমি কিছুই বলব না। আমি অযোগ্য, আমি বিশ্বাসঘাতক, আমি খুনী—

স্কট উঠে দাঁড়িয়ে আরও জোরে পোশাকটাকে টেনে ছিঁড়তে লাগল। তারপর একসময় ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে লাগল বাইরের দিকে।

কেউ তাকে ধরে রাখতে পারল না। এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হল স্কটের এই রহস্যজনক ব্যাপারকে কেন্দ্র করে।

ফাদাররা ব্যাপারটির গুরুত্ব বিবেচনা করে দীক্ষা উৎসব বাতিল করে দিলেন। এই ধরনের ঘটনা এই গির্জায় আগে আর কোনদিন ঘটে নি।

উৎসবের সব বাতি নিভিয়ে ফেলা হল। ধীরে ধীরে সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা চলে গেলেন।

পরের দিন পাওয়া গেল আরও গুরুতর সংবাদ।

শোনা গেল মাইকেল স্কট রাত্রিবেলায় আত্মহত্যা করেছে। তার কাছে পাওয়া গেছে একটি চিঠি। অনেক বড় একটি চিঠি। সেই চিঠিতে তার নিজের সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা আছে। লেখা আছে অনেক আশ্চর্য কথা।

মাইকেল চিঠিতে লিখেছে—

আমি জোসেফ মূরকে খুন করেছিলাম। কিন্তু কেন খুন করেছিলাম ?

আমি আর জোসেফ মূর ছিলাম ছোট বেলাকার বন্ধু। আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম। একই সঙ্গে একই স্কুলে পড়তাম। আমরা স্থির করেছিলাম জীবনে কেউ কাউকে ছেড়ে কোনদিন দূরে থাকব না।

লেখাপড়ায় জোসেফের খুব মনোযোগ ছিল না। এজন্য ক্লাসে সে ভাল রেজাল্ট করতে পারত না। আমি প্রতিবছরে পাশ করে উপরের ক্লাসে উঠে গেলাম, আর সে নিচের ক্লাসেই রয়ে গেল।

কিন্তু তবু আমার লেখাপড়া খুব বেশিদূর এগোল না। জোসেফের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেল। তার কারণ সংসারের ঝামেলা। জোসেফের বাবার সঙ্গে আমার বাবার একটি যৌথ কারবার ছিল। সেই ব্যবসাই ছিল আমাদের দু'জনের পরিবারেরই একমাত্র সম্বল এবং একমাত্র আয়ের পথ।

কি একটা কারণে সেই কারবার নিয়ে খুব গোলমাল শুরু হল। আমার বাবার সঙ্গে জোসেফের বাবারও লেগে গেল খুব ঝগড়া বিবাদ। জোসেফের বাবা আমার বাবাকে খুন করল। খুন করে পালিয়ে গেল অনেক দূরদেশে। পুলিশ এল, তদন্ত শুরু হল। জোসেফের বাবার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এল, কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। পুলিশ দেশের বিভিন্ন জায়গায় খবর পাঠিয়ে জোসেফের বাবার খোঁজ করতে লাগল।

আমি জানতাম জোসেফের বাবা লুকিয়ে কোথায় আছে। জোসেফই একদিন বন্ধুত্বের দুর্বলতা বশতঃ আমার কাছে তাঁর বাবার লুকিয়ে থাকার গুপ্ত স্থানের নাম প্রকাশ করে ফেলেছিল। কিন্তু তার পরেই অসম্ভব ভয় পেয়ে আমাকে অনুরোধ করেছিল আমি যেন সেই কথা কখনও পুলিশকে না বলি, এমন কি কারুর কাছেই প্রকাশ না করি।

আমি তাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম, সেই গুপ্ত কথা কারুর কাছে প্রকাশ করব না। কিন্তু বারবার অনুরোধ করেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। আমাকে দিয়ে সে ভগবানের নামে শপথ করিয়ে নিয়েছিল, যাতে আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি। বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য আমি ভগবানের নামেই শপথ করেছিলাম।

কিন্তু ক্রমে ক্রমেই আমাদের সংসারের অবস্থা খুব খারাপ হতে লাগল। তার উপর শোচনীয় হতে লাগল আমার মায়ের অবস্থা। আমার মা দিনরাত জোসেফের বাবাকে অভিসম্পাত দিত। উত্তেজিত হয়ে তার নামে অনেক রকম কথা বলত। মাঝে মাঝে আমার মনে হত, জোসেফের বাবা ধরা পড়লে এবং শাস্তি পেলেই বুঝি মায়ের

মনের রাগ প্রশমিত হবে। আমার মা হয়ত তাতে মনে শান্তিও পাবে।

মায়ের ঐরূপ অবস্থা দেখে আমার কোন কোন দিন মনে হত, আমি প্রকাশ করে দিই জোসেফের বাবার খবর, সে ধরা পড়ুক, শাস্তি পাক। কিন্তু বন্ধুত্বের কথা ভেবে ও ভগবানের নামে শপথ করেছি বলে অনেক কষ্টে আমি মনের রাগ দমন করতাম।

তিন চারটা বছর কেটে গেল।

কিন্তু মায়ের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল, শোচনীয় হতে লাগল আমাদের সংসারের অবস্থা। আমি আর সহ্য করতে না পেরে সংসার থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কোথায় যাব স্থির করতে না পেরে এই গির্জায় আশ্রয় গ্রহণ করলাম। এখানেই পড়াশোনা করতে লাগলাম— শুরু করলাম ধর্মশিক্ষা গ্রহণ।

ধর্মস্থানের আশ্রয়ে এসে মনে কিছুটা শান্তি পেলেও মায়ের জন্য মাঝে মাঝেই মনটা কেমন করত। কিন্তু এখানে এলে তো আর ঘরে ফিরে যাওয়া যায় না। তাই আমি হয়ে পড়েছিলাম একান্ত ভাবেই নিরুপায়।

মাঝে মাঝে অবশ্য নানা ভাবে বাড়ির খবরাখবর নিতাম।

কেন জানি না, কিছুদিনের জন্য আমার মনে একটা দুর্বুদ্ধি চেপেছিল। হয়ত আমি খারাপ হয়েই যেতাম। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম।

কেটে গেল আরও বেশ কিছুদিন।

একদিন একটি খবর পেয়ে আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। জানতে পারলাম জোসেফের বাবা ধরা পড়েছে। পুলিশ খুঁজে বের করেছে তাকে। বিচারও চলেছে।

ভেবেছিলাম মামলার ব্যাপারে আমার ডাক পড়বে। এই পবিত্র পরিবেশ ছেড়ে আমাকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও যেতে হবে আমাদের বাড়িতে। কিন্তু না, আমার ডাক পড়ল না। কিছুদিন পর জানতে পারলাম, বিচারে জোসেফের বাবার ফাঁসির হুকুম হয়েছে।

জোসেফের বাবার ফাঁসি হয়ে গেল। তারপর ঘটল আর একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। কিছুদিন পর দেখলাম জোসেফ বাগানের মালীর চাকরি নিয়ে আমাদের এই পবিত্র গির্জার এলাকাতেই চলে এসেছে।

হঠাৎ একদিন তাকে দূর থেকে দেখে আমি চমকে উঠলাম। কি ব্যাপার? কেমন করে সে এখানে এল? চাকরি পেলই বা কেমন করে? আমাকে কোন খবর দিল না কেন?

কিন্তু এটা বুঝতে পারলাম, তার বিদ্যাশিক্ষার পরিধির অনুসারেই সে ঐ ধরনের চাকরি পেয়েছে। এর চেয়ে উচ্চতর কোন চাকরির যোগ্যতা তার ছিল না।

যেহেতু জোসেফ নিজে আমাকে কোন খবর দেয় নি, তাই আমি যেচে তার সঙ্গে দেখা করলাম না। একদিন বাগানের কাছে পথের মধ্যে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল। তখন তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে সে কথা বলল না। বরং এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করল। যেন আমাকে চেনে না, এমন ভান করল সে। আমিও এড়িয়ে গেলাম।

তারপর আর কোনদিন আমি জোসেফের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি নি।

কিন্তু অন্তরালে থেকেও তার খবর সব সময় রাখতাম।

শুনতে পেয়েছিলাম তার স্বভাব চরিত্র খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। খুব নেশা করে। দূর থেকে তাকে দেখে মনে হত সে যেন আমার উপর খুব সন্দিহান। হয়ত তার মনে বদ্ধ ধারণা আমিই তার বাবার লুকিয়ে থাকার খবর প্রকাশ করে দিয়েছিলাম, তার ফলেই তার বাবা ধরা পড়েছিল। তাকে মাঝে মাঝে খুব উত্তেজিত অবস্থাতে দেখতাম। দূর থেকে আমার দিকে অনেক সময় সে কুটীল দৃষ্টিতে তাকাত। কোন কোন সময় তাকে দেখে মনে হত, সে আমাকে গোপনে হত্যা করার একটা ষড়যন্ত্র করছে।

যতই দিন যেতে লাগল ততই মনে হতে লাগল, জোসেফ আমার একটা ক্ষতি করবেই।

জোসেফ আমার পরম শত্রু—পরম শত্রু !

আমিও তখন স্থির করলাম, আমি আমার শত্রুকে আর জিইয়ে রাখব না। আমি তাকে খুন করব। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব আমি। ওর বাবা আমার পিতৃহত্যাকারী অপরাধী তা জেনেও সে তার বাবাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। অথচ আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি নি। তার মর্যাদা না দিয়েই সে আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করছে। আমি আর তাকে ক্ষমা করব না।

জোসেফকে হত্যা করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম।

সুযোগ পেতে আমার খুব অসুবিধা হল না। জোসেফ নেশা করে অনেক সময়ই আবোল তাবোল বকত। অনেক সময় নির্জীব হয়ে পড়ে থাকত। তাই সেই সুযোগ নিয়ে তাকে একদিন হত্যা করলাম। ডাক্তাররাও ঐ খুনের ঘটনাকে আত্মহত্যা বলেই চালিয়ে দিলেন।

আমাকে কেউ সন্দেহ করল না।

কিন্তু আমি জানি, ধরা না পড়লেও আমি অপরাধী। জানি না অপরাধের বিচারে কার দিক বেশি ভারী হবে। তবু সেই ঘটনার পর থেকে মনে আমি শান্তি পেতাম না। একটা মস্ত বড় ভুল বোঝাবুঝি রয়ে গিয়েছিল দু'জনের মধ্যে। ভুলতে চেষ্টা করতাম এই ব্যাপারটাকে। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় যে ঘটনা ঘটে গেল তারপর আর মনকে স্থির রাখতে পারলাম না। আমি সত্যি ধর্মযাজক হবার উপযুক্ত নই। আমি অপরাধী।

ফাদারদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, তাঁরা যেন আমার ও জোসেফ মূরের আত্মার কল্যাণের জন্য ভগবানের কাছে একান্তভাবে প্রার্থনা করেন।

ওদিকে ডেভিডের জ্ঞান আগের দিন রাত্রেও ফেরে নি। তার জ্ঞান ফিরল সেদিন বিকেল বেলা।

অনেক লোক তাকে ঘিরে ধরল। অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল তাকে। সে বলল—সব কথা তার মনে নেই। তবে কাল সন্ধ্যাবেলা সে একটু নেশা করেছিল। তারপর গিয়ে বসেছিল নির্জনে কবরখানার পাশে। তার কাছেই ছিল জোসেফ মূরের কবর। হঠাৎ তার মনে হল জোসেফের কবর থেকে যেন একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে তার দিকেই। নেশার ঘোরেও সে ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল।

তারপর কোন কথা আর তার মনে নেই।

— —

রেল লাইনের ভূত

ছুটে চলেছে কোল ফিল্ড এক্সপ্রেস। ইঞ্জিনের তীব্র সার্চলাইটের আলোর সামনের ইস্পাতের লাইন দুটি ঝকঝক করছে। এর পরের স্টেশন বর্ধমান। তার আগে আর কোথাও থামার কথা নয়। যাত্রীরা সবাই নিশ্চিন্তে বসে ছিলেন যে যার কামরায়। হঠাৎ একি? আচমকা গাড়িটা থেমে গেল কেন?

কি ব্যাপার? যাত্রীরা অনেকেই ভয়ে ও কৌতূহলে কামরা থেকে বেরিয়ে এল। লম্বা গাড়ির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাবার রাস্তা ছিল। হঠাৎ দেখা গেল গার্ড সাহেব হন্তদন্ত হয়ে সেই পথ দিয়ে ইঞ্জিনের দিকে চলেছেন। ইঞ্জিন ঘরে ঢুকে সবাই অবাক। ক্লীনার অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ড্রাইভার এক কোণে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। গার্ড ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি লছমন সিং? গাড়ি থামালে কেন?

ড্রাইভার লছমন সিং কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিল—হাম নেহি রোকা হুজুর। এক আউরত।

—আউরত! কোন্ আউরত?

লছমন সিং তার নিজের ভাষায় যা বলল তার অর্থ এই—আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম, আর ক্লীনার ঐ কোণে বসে বসে ঢুলছিল। শক্তিগড়ের কাছে যখন এসেছি তখন দেখলাম এক আউরত আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি জোরে চলেছে, তবু কি করে ইঞ্জিন ঘরে এল বুঝতে পারলাম না। এমন সময় লাইনের উপর দেখি একটা বাচ্চা ছেলে হামা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আউরত চীৎকার করে বলল—ড্রাইভার, ব্রেক লাগাও। আমার বাচ্চাটা মরে যাবে। সে নিজেই ব্রেক কষবার জন্য এগিয়ে এল। আমি তখন ব্রেক কষলাম, ছেলেটাকে তবু বাঁচাতে পারলাম না। ছেলেটা পিষে গেল। তা দেখেই আউরতটা লাফিয়ে পড়ল ইঞ্জিন থেকে। লাফিয়ে পড়বার আগে তার দিকে একবার চোখ পড়েছিল আমার! উঃ, সে কি মূর্তি! ধড়ের ওপর মাথা নেই। রক্তে গা ভেসে যাচ্ছে!

লছমন সিং হাঁপাতে লাগল। কোন রকমে ট্রেনটাকে নিয়ে আসা হল বর্ধমানে। সেখানে ড্রাইভার বদলি হল।

এই ঘটনার সপ্তাহ খানেক পর ঘটল ঠিক একই ঘটনা। একই জায়গায় ট্রেনটা আটকে গেল। রহস্য কিছু বোঝা গেল না। কিছুদিন পর এল নতুন শিখ ড্রাইভার। সে সাহসী, ভূত বিশ্বাস করে না।

বেশ কিছুদিন ভালভাবে চলার পর আবার সেই রকম ঘটনা ঘটল। ঠিক ঐ জায়গায় ট্রেনটি এলেই ড্রাইভার রেলিং এর ধারে দাঁড়িয়ে থাকত কিছু হয় কিনা দেখবার জন্য। হঠাৎ ক্লীনারের আর্তনাদ শুনে ছুটে ভিতরে গেল। গিয়ে দেখল একটি স্ত্রীলোক ইঞ্জিনের অ্যাক-সেলারেটারের উপর চাপ দিয়ে চলেছে। ক্লীনার বেহুঁশ।

শিখ ড্রাইভারও ভয় পেয়ে গেল। সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরল প্যাণ্টোগ্রাফের স্যুইচ। প্যাণ্টোগ্রাফ ওভারহেড ট্র্যাকশানের সঙ্গে ইঞ্জিনের সংযুক্তি বজায় রাখে। ড্রাইভার সেটা চেপে ধরার ফলে হঠাৎ সংযোগস্থলে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। সেই আলোতে স্ত্রীলোকটি ফিরে তাকাল পিছন দিকে। ড্রাইভার দেখে চমকে উঠল। স্ত্রীলোকটির মাথা নেই, সর্বাঙ্গ রক্তে ভেজা। হঠাৎ স্ত্রীলোকটি লাফিয়ে পড়ে গেল।

এরপর জানা গেল ব্যাপারটা। মাসখানেক আগে এই কোলফিল্ড এক্সপ্রেসকে নিয়েই এই ঘটনা। এক গ্যাংম্যানের বউ সন্ধ্যাবেলা এসেছিল লাইনের ধারে মেলে দেওয়া কাপড় তুলে নিতে। কোলের ছেলেটাকে রেখেছিল লাইন থেকে একটু দূরে। ছেলেটা হামা দিয়ে লাইনের উপর এসে পড়েছিল। এমন সময় দানবের মত এসে হাজির হয় এক্সপ্রেস। সে চীৎকার করে গাড়ি থামাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ট্রেনটা ছেলেটাকে পিষে দিয়ে বেরিয়ে যায়। মা আর থাকতে পারে না। সেও ঝাঁপিয়ে পড়ে ট্রেনের চাকার উপর। দুজনেই শেষ হয়ে যায়। যেদিন ঠিক ঐ সময়ে গাড়িটা ঐ জায়গা দিয়ে যায় তখনই এই ভৌতিক ঘটনা ঘটে। গাড়িটা আগে বা পরে এলে কিছু হয় না।

—:—